

ক্ষুরধার খেলা

অনীশ দেব



একটি নয়, দু-দুটি ক্ষুরধার রহস্য-উপন্যাস এ-বইয়ের দু-মলাটের মধ্যে। দুটি কাহিনীই প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত চুম্বকের মতো টেনে রাখে পাঠকের কৌতূহলকে।

প্রথম কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে একটি টেলিফোন। নতুন বিবাহিত সুখী জীবনে যখন সবে পরিপূর্ণ মিলি, ঠিক তখনই একটা অজ্ঞাত কণ্ঠের টেলিফোন পলকে চুরমার করে দিল তার নিশ্চিন্ত সুখের ঘর আর নিরাপত্তার দেওয়ালগুলোকে। কোন্ ভয়ঙ্কর মানুষের সঙ্গে ঘর বেঁধেছে মিলি? কতটুকু চেনে তাকে? টেলিফোনের অপর প্রান্তের কণ্ঠে যেন সাপ-খেলানো সুর, অমোঘ সম্মোহন। কার কণ্ঠ? কী হবে মিলির?

দ্বিতীয় কাহিনীর পটভূমি উত্তরপ্রদেশের বরফে-ঢাকা পাহাড় ও রহস্যময় জঙ্গল। এ-কাহিনীর নায়ক মনোবিজ্ঞানী অনন্তনারায়ণ বসু রায়, নায়িকা তাঁরই রূপসী স্ত্রী সীতা। ত্রিভুজ প্রেমের তৃতীয় বাহুতে রয়েছেন ক্যাপ্টেন মথুর সিং। এক মিলিটারি-মানুষ। আর এই তিনজনকে জড়িয়ে যে-ক্ষুরধার খেলা, তার পিছনে এক অদ্ভুত গবেষণা : মানুষ-নেকড়ে কিংবা নেকড়ে-মানুষ কি সত্যি রয়েছে? রুদ্ধশ্বাস নানা ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে শেষাবধি এক ভয়ঙ্কর সত্যের উন্মোচন। কী সেই সত্য? কেমন চেহারা তার?

ক্ষুরধার খেলা

ক্ষুরধার খেলা

অনীশ দেব

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৯৪
প্রচ্ছদ অনুপ রায়

ISBN 81-7215-350-3

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত ।

মূল্য ২০·০০

বিমল কর
শ্রদ্ধাস্পদেষু

ক্ষুরধার খেলা : এক

মিলির হাতের মুঠোয় টেলিফোনের রিসিভারটা ধীরে ধীরে সাপ হয়ে যাচ্ছিল। বিষধর সাপ। কেমন পিচ্ছল, ঠাণ্ডা। রিসিভার থেকে বেরিয়ে আসা প্যাঁচানো তারটা ওর ফরসা হাত আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। আর টেলিফোনে এইমাত্র শোনা কথাগুলো যেন সাপের বিষ। মিলির বুকের ভেতরটা পলকে নীল হয়ে গেল। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

ফোনের ও-প্রান্তে লোকটা তখনও কথা বলছে। আর মাঝে মাঝে খসখসে গলায় হাসছে। চাপা হাসি। যেন বেশ মজা পেয়েছে।

লোকটার কথাগুলো শুরু থেকে ভাবতে চেষ্টা করল মিলি।

একটু আগেই ড্রইং-কাম-ডাইনিং স্পেসের দেওয়ালে টাঙানো কোয়ার্জ ঘড়িতে চারটের ঘণ্টা বেজে উঠেছে মিষ্টি সুরে। সুনীতই পছন্দ করে এরকম সুরেলা ঘড়ি কিনেছে। ও গানবাজনা আর সুর ভীষণ পছন্দ করে। আর ঠিক তার সঙ্গে সঙ্গেই বেজে উঠেছে টেলিফোন।

সামনেই সাজানো শো-কেস। তার ওপরে একপাশে লেসের কারুকাজ করা ঢাকনা দেওয়া নীল রঙের টেলিফোন। রিসিভার তোলার সময়ে মিলি ভেবেছিল সুনীতেরই ফোন। অফিস থেকে মাঝে মাঝেই ছেলেমানুষের মতো ফোন করে ও। বলে, 'ম্যাডাম, ঘর ফাঁকা পেলাম তাই টেলিফোনে একটু আদর করতে ইচ্ছে হল।' তারপর ছুড়ে দেয় চুমুর শব্দ। একেবারে যা-তা। বিয়ের পর দু'-বছর কেটে গেছে, তবু অসভ্যতা কমেনি। সে-কথা বলে মিলি যদি কপট ধমক দেয় তাহলে আরও মুশকিল। নির্লজ্জের মতো হেসে সুনীত বলে, 'দোহাই তোদের একটুকু চুপ কর। ভালোবাসিবারে দে আমারে অবসর।'

ওর কথা ভেবেই রিসিভারে প্রথম কথা বলেছে মিলি। আর তখনই ওকে অবাক করে একটা অচেনা পুরুষকণ্ঠ ফোনের ও-প্রান্ত থেকে খসখসে চাপা গলায় প্রশ্ন করেছে: 'হ্যালো, চাঁদু আছে?'

চাঁদু! কে চাঁদু!

আরও অবাক হয়ে মিলি জিগ্যেস করেছে, 'আপনি কত নম্বর চাইছেন?'

'থ্রি জিরো নাইন ওয়ান থ্রি ফাইভ—'

আশ্চর্য! নম্বর তো ঠিকই বলছে!

একটু ইতস্তত করেই মিলি বলেছে, 'নম্বর ঠিকই আছে, তবে—ইয়ে—চাঁদু নামে এখানে কেউ থাকে না।' একটু থেমে আরও বলেছে, 'আপনার বোধহয় ভুল হয়েছে।'

লোকটা এবার অবাক হল। বলল, 'ভুল! কী বলছেন! এটা চাঁদুর ফ্ল্যাট না?'

'না।' মিলি বিরক্ত হয়ে বলল।

'আশ্চর্য। ও-ই তো গতকাল আমাকে এই ফোন নম্বরটা দিল।' কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে লোকটা আবার বলল, 'ম্যাডান স্ট্রিটে ওর ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টের বিজনেস আছে না! ওর পুরো নাম চন্দ্রকান্ত সেন—সি. কে. সেন। লম্বা, ফরসা দেখতে। চোখে চশমা আছে। কোঁকড়ানো চুল—'

মিলি তখন হোঁচট খেয়েছে। শুধু নামটুকু ছাড়া আর সবকিছুই যে মিলে যাচ্ছে সুনীতের সঙ্গে।

টেলিফোনে সে-কথাই বলল ও, 'আপনি যা বলছেন সেগুলো সবই...মিলছে...তবে নামটা ভুল হচ্ছে—'

'ভুল!' এবারের কথার ঢঙে সামান্য চাপা ব্যঙ্গ টের পেল মিলি। লোকটা সেই একই সুরে আরও বলল, 'শুধু নামটা ভুল হচ্ছে.? তো নামটা কী হবে, শুনি—'

মিলি বলল, 'এস. কে. সেন। সুনীতকুমার সেন—'

আর তখনই হাসিতে প্রায় ফেটে পড়ল লোকটা। হাসছে তো হাসছেই। খসখসে গলার অদ্ভুত হাসি।

অনেকক্ষণ পর হাসি থামিয়ে মজার সুরে বলল, 'ও, এখন এই নাম নিয়েছে বুঝি!'

কথাগুলো শোনার সঙ্গে-সঙ্গে টেলিফোনের রিসিভারটা মিলির হাতের মুঠোয় ধীরে-ধীরে একটা সাপ হয়ে যেতে শুরু করল। ঠাণ্ডা, পিছল, বিষধর সাপ।

'এখন এই নাম নিয়েছে বুঝি!' কথাটার মানে কী? মিলির বুকের ভেতরটা হঠাৎই যেন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল।

লোকটা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিগ্যেস করল, 'আপনি কে কথা বলছেন জানতে পারি?'

মিলি তখনও নিজেকে সামলে নিতে পারেনি। নিচু গলায় কোনওরকমে বলল, 'আমি—আমি মিসেস সেন—সুনীতের স্ত্রী...'

'ও, চাঁদু বিয়েও করেছে!' যেন আপনমনেই বলল লোকটা। তারপর, 'ওর বিয়ের খবর তো বলেনি আমাকে! ও কখনও বিয়ে করবে ভাবিনি—মানে, বিয়ে করাটা ওর পক্ষে একটু...মানে, ও বিয়ে না করলেই ভালো হত...'

মিলি বুঝতে পারছে ওর এখন পালটা প্রশ্ন করা উচিত। আপনি কে কথা বলছেন? সুনীতের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী? বা এইরকম আরও অনেক প্রশ্ন। কিন্তু লোকটার কথার মধ্যে সম্মোহনের ছোঁয়া ছিল যেন। দুরন্ত কোনও সাপুড়ে বিষধর সাপ নিয়ে বেপরোয়া খেলা করছে।

লোকটা জিগ্যেস করল, 'কদ্দিন বিয়ে হয়েছে আপনাদের?'

মিলি টের পেল, ও লোকটার বশে চলে যাচ্ছে ক্রমশ। ও আচ্ছন্ন গলায় বলল, 'দু'-বছর।'

লোকটার গলা এবারে বেশ গম্ভীর হল। কথার ঢঙে একটা মাস্টারি ভাব ফুটিয়ে সে বলল, 'মিসেস সেন, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি আপনার শত্রু নই—বন্ধু। চাঁদুকে আমি বহুদিন ধরে চিনি—সেই ছোটবেলা থেকেই। ওর অনেক গোলমাল আছে। মাঝখানে বেশ কয়েকবার ওর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। গতকালই পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাথে ফ্লুরিজের সামনে হঠাৎ দেখা। ফোন নম্বর দিয়ে বলেছিল আজ চারটে নাগাদ ফোন করতে। কিন্তু...কিন্তু বিয়ে করেছে বলেনি। আর...আর নামটা যে পালটেছে তাও

বলেনি...'

'আমি...আমি কিছু বুঝতে পারছি না...' মিলির গলার স্বর ভাঙছিল। মাথাটাও কেমন যেন টলতে শুরু করেছে।

লোকটা শান্ত গলায় বলল, 'আপনি একটু সাবধানে থাকবেন, মিসেস সেন। চাঁদুকে নিয়ে আরও অনেক কথা আপনাকে বলা উচিত। সাবধান করে দেওয়া উচিত। কিন্তু এখন অত সময় নেই। তাছাড়া চাঁদু হঠাৎ এসে পড়তে পারে। আমি পরে আপনাকে আবার ফোন করব—'

'আচ্ছা—'

'তবে একটা কথা। আমি যে ফোন করেছি, আপনাকে এসব কথা বলেছি, চাঁদু যেন জানতে না পারে।' এইবার লোকটার গলার স্বর খানিকটা শক্ত হল : 'যদি আপনি ওকে এসব বলেন, তাহলে আমি ঠিক জানতে পারব। তখন আর আমার ফোন পাবেন না। আপনার কপালে যা আছে তাই হবে—'

মিলি প্রায় কেঁদে ফেলল কথা বলতে গিয়ে, 'না—না, বলব না। কিচ্ছু বলব না ওকে—'

'প্রেম করে বিয়ে করেছেন ?' আচমকা প্রশ্ন করল লোকটা।

'হ্যাঁ—' মিলির বুকের ভেতরে বরফ জমছিল। তারই ওপরে পাগলের মতো হামানদিস্তে পিটছিল কেউ।

'বিয়ের আগে কদ্দিন চিনতেন চাঁদুকে ?'

'বেশিদিন না। মাস ছয়েক—'

'ও, সেইজন্যেই—' লোকটা যেন আপনমনে কথা বলল, 'ঠিক আছে, মিসেস সেন। মিছিমিছি ভয় পাবেন না। আমি পরে আবার ফোন করব। চাঁদু যখন বাড়ি থাকবে না, তখন।'

তারপরই ফোন রেখে দিল লোকটা। আর মিলি পাথরের মূর্তি হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। ভাবতে লাগল সুনীতের কথা।

অবশেষে রিসিভার নামিয়ে রাখল মিলি। তখনই চোখ পড়ল শো-কেসের ওপরে দেওয়ালে টাঙানো বড় মাপের ছবিটার দিকে। সবুজে সবুজে ঢাকা এক ঘন জঙ্গল। তারই মধ্যে সূর্যের লুকোচুরি খেলা। এলোমেলো পত্রসজ্জার ফাঁক-ফোকর দিয়ে আলোর নানারকম রেখা ঢুকে পড়েছে ভেতরে।

এই ছবিটা সুনীত কিনেছিল আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের এক প্রদর্শনী থেকে। মিলির কাছে ব্যাপারটা মনে রাখার মতো। কারণ সেই প্রদর্শনীতেই ওর সঙ্গে সুনীতের প্রথম আলাপ। দু'-বন্ধুর সঙ্গে 'মৃচ্ছকটিক' নাটক দেখতে গিয়েছিল মিলি। শো শুরু হতে দেরি ছিল। তাই হাতে সময় আছে দেখে ঢুকে পড়েছিল আর্ট গ্যালারিতে। ছবি দেখে দেখে সময় কাটাচ্ছিল আর প্রত্যেকটা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে নানারকম মন্তব্য করছিল। জঙ্গলের এই ছবিটার সামনে এসে ঠাট্টা করে মিলি বলেছিল, 'এই দ্যাখ, এই ছবিটার নাম "জঙ্গল মে মঙ্গল"।' ওর দু'-বন্ধু সুতপা আর দেবলীনা এ-কথায় হেসে উঠতেই এক সুদর্শন যুবক আহত গলায় বলে উঠেছে, 'একজন শিল্পীর কাজ নিয়ে ঠাট্টা করছেন !' ছেলেটির চেহারা বেশ ফিটফাট। ডান হাতে ঝোলানো ব্রিফকেস। চোখে চশমা।

মিলি লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল, ভেবেছিল, এই লোকটাই শিল্পী নাকি ? কিন্তু পরে

কথাবার্তা সামান্য এগোতেই বুঝতে পেরেছে, না, শিল্পী নয়, তবে ছবির সমঝদার।

প্রথম আলাপেই ভারতীয় চিত্রকলার ওপরে প্রায় পাঁচ পৃষ্ঠা লেকচার দিয়ে ফেলেছিল সুনীত। ওর কথা, কথা বলার ভঙ্গি, মিলির মনে দাগ কেটেছিল।

ছ'-মাসে আলাপ যতই এগিয়েছে ততই অবাক হয়েছে মিলি। ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টের ব্যবসা করে—বেশ বড় ব্যবসা—অথচ শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতে কী আশ্চর্য টান! ওকে নিয়ে নাটক-সিনেমা দেখেছে সুনীত, গেছে গানের জলসায়। একসঙ্গে কত সময় কাটিয়েছে ওরা।

পরিচয়ের যখন পাঁচ মাস কেটে গেছে তখন মিলির মনে হয়েছে, সুনীতের হাত ধরে ভালোবাসার পথ হাঁটতে হাঁটতে নানা অলিপথ পেরিয়ে ও এতদূরে চলে এসেছে যে, এখন আর ফেরার কোনও উপায় নেই। ফেরার কোনও মানে হয় না।

ছ'-মাসের মাথায় বিয়ে হল ওদের। সুনীতের বাবা-মা আত্মীয়-পরিজন বর্ধমানের বাসিন্দা। বনেদী বড়লোক। নানারকম ব্যবসা ওঁদের। ওঁদের বংশে সুনীতই প্রথম কলকাতায় থিতু হয়েছে। ব্যবসা করে বড় হয়েছে। অরবিন্দ সরণিতে ফ্ল্যাট কিনেছে। বিয়ের পর সেই ফ্ল্যাটেই দুটো বছর কেটে গেছে মিলির। সেই ফ্ল্যাটে একটা নীল রঙের টেলিফোন আছে। একটু আগে, ঠিক চারটের সময়, সেই টেলিফোনটা বেজে উঠেছিল। আর একটা অচেনা লোক টেলিফোনে নানা কথা বলে মিলি সেনকে ভয় পাইয়ে পাথর করে দিয়েছে।

চন্দ্রকান্ত সেন—সি. কে. সেন। সুনীতের সঙ্গে আড়াই বছরের পরিচয়ে কখনও এই নামটা শোনেনি মিলি। বিয়ের সময়, আর তার পরে দু'-বার—মোট তিনবার বর্ধমানে গেছে ও। কিন্তু না, সেখানেও চন্দ্রকান্ত বা চাঁদু নামটা কানে আসেনি। তাছাড়া বিশেষ কোনও কারণ না থাকলে কেউ হঠাৎ হঠাৎ নাম পালটাবে কেন? তাছাড়া সুনীতের ব্যাপারে ওকে সাবধান করে দিতে চায় টেলিফোনের অচেনা ওই লোকটা। কেন, সুনীতকে কিসের ভয়?

জঙ্গলের ছবিটার দিকে তাকিয়ে আনমনাভাবে এসব কথা ভাবছিল মিলি। হঠাৎই মেঘের ডাকে চমকে উঠল। সামনের জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। চারতলার এই সুদৃশ্য ফ্ল্যাট আকাশের অনেক কাছাকাছি। আকাশে বর্ষাশেষের মেঘ জমছে। বৃষ্টি হতে পারে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে এলোমেলো। দূরের একটা অশথ গাছ বাতাসে অস্থির হয়ে উঠেছে।

'রুমি! রুমি!' বলে ডাকতে ডাকতে জানলার শার্সিগুলো বন্ধ করতে শুরু করল মিলি।

রুমি বছর দশেকের কাজের মেয়ে। ছোট শোবার ঘরটায় মেঝেতে চাদর বিছিয়ে ঘুমোচ্ছে এখনও। ওর মা সকালে আর সন্ধেবেলা ঠিকে কাজ করে। ঘরদোর মুছে সাফ করে, বাসন মাজে, কাপড় কাচে। আর রুমি মাকে সাহায্য করে, সকলের ফাইফরমাশ খাটে। সুনীত যখন বাড়িতে থাকে না তখন রুমিই মিলির সঙ্গী। নইলে একা এই ফ্ল্যাটে সময় কাটাতে ভীষণ ভয় করত মিলির।

মিলির ডাকে উঠে পড়েছিল রুমি। চোখ ডলতে ডলতে ড্রইং-কাম-ডাইনিং স্পেসে এল। তারপর বউদির ফরমাশ শুনে বলল, 'মুখে একটু জল দিয়ে এক্ষুণি জানলা এঁটে দিচ্ছি—'

মিলি স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারছিল না। এমনকি রুমিকে কাজের

কথা বলতে গিয়েও ওর গলা কেমন যেন ঠোঁটে গিয়ে যাচ্ছিল বারবার। হঠাৎই ওর মনে হল, সুনীতের বইপত্রগুলো ঘেঁটে দেখলে কেমন হয়! তার মধ্যে কোথাও হয়তো পাওয়া যেতে পারে চন্দ্রকান্ত বা চাঁদু নামটা।

ড্রইং স্পেসের বাঁ দিকের দেওয়ালে সুন্দর ডিজাইনের দেওয়াল-ক্যাবিনেট। হালকা ও গাঢ় বাদামী ল্যামিনেটেড প্লাস্টিকের আস্তরণের ওপরে সুদৃশ্য পেতলের নব। এরই মধ্যে সুনীতের যত পছন্দের বইপত্র সাজানো রয়েছে।

দুরুদুরু বুকে ওটার কাছে এসে দাঁড়াল মিলি। ওর মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছিল, বুককেসের পাল্লা খুললেই যেন একটা কেউটে ওর কপালে ছোবল মারবে।

তেরচা নজরে রুমিকে একবার দেখল মিলি। বাচ্চা মেয়েটা আপনমনে কাজ করছে। সুতরাং পাল্লা খুলে শুরু হল অনুসন্ধান।

একটার পর একটা বই বের করে দেখতে লাগল মিলি। বিয়ের আগে কেনা বইগুলোতে শুধু সুনীতের নাম লেখা। আর পরের বইগুলোতে ওদের দুজনের নাম। নামের নীচেই বছরের উল্লেখ রয়েছে। কী সুন্দর হাতের লেখা!

মিলি বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে একেবারে ডুবে গিয়েছিল। বইয়ের থাক ধরে ধরে নামিয়ে ফেলেছে মেঝেতে। কিছু বই রেখেছে পাশের খাটো টেবিলে। বইগুলো আবার ঠিক আগের মতো করে সাজিয়ে রাখতে হবে। নইলে সুনীত রেগে যাবে। নিজের সমস্ত জিনিসপত্র ও সবসময় সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে। সুতরাং কোন বইটা কোন তাক থেকে নামিয়েছে সেটা মনে মনে আওড়ে একরকম মুখস্থই করছিল মিলি।

ঠিক তখনই ফ্ল্যাটের কলিংবেল বেজে উঠল ভোরের পাখির ডাকে।

মিলি চমকে গেল ভীষণভাবে। সুনীত কি ফিরে এল অফিস থেকে? তাকাল দেওয়ালঘড়ির দিকে: পৌনে পাঁচটা। এত তাড়াতাড়ি খুব একটা ফেরে না ও। তবুও তাড়াহুড়ো করে বইগুলো আগের জায়গায় সাজিয়ে রাখতে লাগল মিলি। বেল বেজে উঠল দ্বিতীয়বার।

ও কিছু বলে ওঠার আগেই রুমি বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। ছুটে চলে গেল দরজা খুলতে। মিলি অসহায়ভাবে ব্যাপারটা দেখল।

দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকল সুনীত। রোজকার মতো ব্রিফকেস মেঝেতে নামিয়ে রেখে মাথা ঝুঁকিয়ে জুতো মোজা খুলতে লাগল। আধ মিনিট। তারপরই সোজা হয়ে ঘরের দিকে দু-পা বাড়িয়েই মিলিকে দেখতে পেল।

মিলি তখন বুককেসের পাল্লা ঠেলে বন্ধ করে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু বেশ কয়েকটা বই এখনও টেবিলে আর মেঝেতে।

সুনীতের ভুরু কুঁচকে গেল। কপালে ভাঁজ পড়ল। সুন্দর মুখে চোয়ালের রেখা শক্ত হয়ে উঠল।

'কী ব্যাপার? তুমি ওখানে কী করছ?'

মিলি তক্ষুণি কোনও কথা খুঁজে না পেয়ে বোকার মতো হাসল।

সুনীত ওর কাছে এগিয়ে এল। টেবিলে আর মেঝেতে পড়ে থাকা বইগুলোকে একবার দেখল। তারপর বিরক্তভাবে বলল, 'সরো, আমি গুছিয়ে রাখছি—'

'আমি বইগুলো একটু ঝাড়পোঁছ করে রাখছিলাম—' কেঁপে যাওয়া গলার স্বর যতটা সম্ভব ঠিকঠাক রাখতে চেষ্টা করল মিলি: রুমিকে লক্ষ করে বলল, 'তোর দাদাকে এক গ্লাস জল দে।'

সুনীত গম্ভীর মুখে বইগুলো তাকে গুছিয়ে রাখছিল। মিলি ইতস্তভাবে ওকে সাহায্য করতে লাগল। চুপচাপ সময় কাটছে।

রুমি এক গ্লাস জল এনে দিল সুনীতকে। ওর জল খাওয়া শেষ হতেই মিলি জিগ্যেস করল, 'আজ তাড়াতাড়ি সব কাজ শেষ হয়ে গেল?'

সুনীত ছোট্ট করে বলল, 'হুঁ—'

মিলির মনে হল কোথায় যেন তাল কেটে গেছে। টেলিফোনের লোকটার কথা ওর মনে পড়ছিল। 'ওর অনেক গোলমাল আছে', 'ও কখনও বিয়ে করবে ভাবিনি', 'বিয়ের আগে কদ্দিন চিনতেন চাঁদুকে?' 'আমি যে ফোন করেছি, আপনাকে এসব কথা বলেছি, চাঁদু যেন জানতে না পারে।'

বইগুলো সব গোছানো হয়ে গিয়েছিল। রুমি খালি গ্লাসটা নিয়ে চলে গেছে রান্নাঘরে। সুনীত জামাকাপড় ছাড়তে শোবার ঘরে গেল। মিলি জানে, এখন ও স্নান করবে। তারপর হালকা কিছু খাবে। খানিকটা আয়েস করে ড্রইং স্পেসের সোফায় বসে ব্রিফকেস খুলে কাগজপত্র ছড়াবে টেবিলের ওপরে। তারপর দেওয়ালের তাক থেকে ওর ব্যবসার কয়েকটা ফাইলপত্র নিয়ে মশগুল হয়ে যাবে ঘণ্টাখানেকের জন্য। সেই সময়ে মিলি টেপ-ডেকে সুনীতের পছন্দসই গান চালিয়ে যাবে পরপর। আর একই সঙ্গে সুনীতের কাছে বসে টুকটাক কথা বলবে। সুনীত মজা করে এর নাম দিয়েছে 'বিজনেস উইথ প্লেশার'।

টেবিলে সুনীত যখন কাগজপত্র নিয়ে বসল তখন মিলি টেপ-ডেকে 'সেদিন দু'জনে দুলেছিনু বনে...' গানটা চালিয়ে দিয়েছে। সুনীত বউয়ের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল। মিলি জানে এটা ওর প্রিয়তম গান। একটু পরেই লক্ষ করল, ওর চোয়ালের শক্ত রেখা কখন যেন নরম হয়ে গেছে। তখন মিলি ঠিক করল, আজ রাতে, ভালোবাসাবাসির আগে ও সুনীতের সঙ্গে একটা মজার খেলা খেলবে : অষ্টোত্তর শতনামের খেলা। ওকে জানতেই হবে চাঁদুর অস্তিত্ব আছে কি নেই, অথবা কোনওদিন এই নামটার অস্তিত্ব সুনীতের জীবনে ছিল কি ছিল না। তারপর, কাল যখন রহস্যময় সেই টেলিফোনটা আসবে, তখন...

টেলিফোনটা এল দুপুর দুটোর কিছু পরে।

মিলি ওদের শোবার ঘরের লাগোয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। বারান্দার রেলিঙ বেশ চওড়া। তার ওপরে কয়েকটা ছোট ছোট টবে পাতাবাহার গাছ। গাছের পাতায় নানা রঙের ছিটে। সেই এলোমেলো রঙের খেলা দেখছিল মিলি। বারান্দার গ্রিলের বাইরে আকাশ মেঘলা। সকাল থেকেই এইরকম।

এমন সময় টেলিফোনটা এল।

মিলি শোবার ঘরের মধ্যে দিয়ে হেঁটে এল টেলিফোনের কাছে। পাশের ছোট শোবার ঘরের দিকে উঁকি মেরে দেখল। রুমি ঘুমিয়ে পড়েছে।

একটা বিচ্ছিরি ভয় জড়িয়ে ধরল মিলিকে। তবুও কোনও অদৃশ্য চুম্বকের টানে ও রিসিভার তুলে কথা বলল।

ও-প্রান্ত থেকে গতকালের সেই খসখসে গলা শোনা গেল : 'মিসেস সেন, কেমন আছেন?'

মিলি প্রাণহীন গলায় উত্তর দিল, 'ভালো—'

'আপনাকে ধন্যবাদ—চাঁদুকে কিছু বলেননি বলে—'

মিলি চুপ করে রইল।

'আমি আজ আরও কয়েকটা কথা বলব—চাঁদুর সম্পর্কে। আপনি মনটাকে একটু—শক্ত করুন।'

'বলুন—' মিলি টের পেল ওর গলার স্বর অবাধ্য হতে চাইছে। আর বুকের ভেতরে শুরু হয়ে গেছে তুষারপাত।

'আপনি নিশ্চয়ই এতদিনে জেনে গেছেন চাঁদু চাঁদ খুব পছন্দ করে—বিশেষ করে পূর্ণিমার চাঁদ।'

সুনীত ভীষণ চাঁদ ভালোবাসে। অনেক পূর্ণিমার রাতে ওরা দু'জনে অনেকক্ষণ ধরে বারান্দায় বা ছাদে দাঁড়িয়ে থেকেছে। তাছাড়া সুনীতের কাছে ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টের আকর্ষণ যেমন, ঠিক তেমনই আকর্ষণ প্রকৃতির।

'পূর্ণিমার রাতে কখনও ওকে আপনার অস্বাভাবিক বলে মনে হয়নি ?'

প্রাণপণে মনে করার চেষ্টা করতে লাগল মিলি। ওদের শোবার ঘর আর বারান্দার মাঝে কোনও দেওয়াল বা দরজা নেই। আছে তিনভাগে ভাগ করা স্লাইডিং পোলারয়েড প্যানেল, আর টানা ভারী পরদা। মনে পড়ছে, পূর্ণিমার রাতে বারান্দা-দিয়ে-দেখা আকাশে যদি চাঁদ হাজির থাকে তাহলে পোলারয়েড প্যানেলের ওপরে পরদার আড়াল দেয় না সুনীত। তখন চাঁদের আলো এসে পড়ে নরম বিছানায়। ওরা দু'জনে কাছাকাছি হয়। চাঁদের আলোয় শুরু হয় শরীরের খেলা। সুনীতের ভালোবাসা তখন বাঁধ ভেঙে যায়। যেন পাগল হয়ে যায় ও। আর মিলির তখন আনন্দে মরে যেতে ইচ্ছে করে।

এটাকে কি অস্বাভাবিক বলা যায় ? আপনমনেই ভাবল মিলি। তারপর সংশয়ের ঘূর্ণি থেকে কোনওরকমে মাথা তুলে জবাব দিল, 'কী জানি, এক্ষুণি ঠিক মনে পড়ছে না।'

সাপ খেলানো সুরে আবার কথা বলল লোকটা, 'এবার থেকে খেয়াল রাখবেন, টের পাবেন। পরশুদিনই তো পূর্ণিমা। আচ্ছা, চাঁদু মাঝে মাঝে ট্যুরে যায় না ?'

মিলি বুঝতে পারছিল না, এবারের ধাক্কাটা ঠিক কোন দিক থেকে আসবে, ও বলল, 'হ্যাঁ, যায়।'

'শেষ কবে ট্যুরে গেছিল আপনার মনে আছে, মিসেস সেন ?'

'প্রায় মাসখানেক হবে—'

'তবু তারিখটা ক্যালেন্ডারে একটু দেখবেন ? আমি ফোন ধরে আছি।'

সুনীত মাঝে মাঝেই বিজনেস ট্যুরে যায়। দুর্গাপুর, ধানবাদ, উত্তরবঙ্গ, আসাম, আর কখনও কখনও দিল্লি বা বম্বে। শুধু একবার হংকং গিয়েছিল—বিয়ের আগে। সুনীত ট্যুরে গেলে ক্যালেন্ডারের তারিখে দাগ দিয়ে রাখে মিলি, লিখে রাখে ট্যুরের জায়গার নাম। আর হিসেব রাখে, ক'টা দিন সুনীতকে ছেড়ে থেকেছে ও। তারপর ট্যুরের শেষে সুনীত ফিরে এলে ওর কাছ থেকে বাড়তি ভালোবাসা আদায় করে শোধ নেয়। সুনীত এর নাম দিয়েছে 'লাভ ট্যাক্স'। বলেছে, 'মিলি, এতদিন জানতাম শুধু ব্যবসার লাভের ওপরেই ট্যাক্স দিতে হয়।' তখন মিলি হেসে উত্তর দিয়েছে, 'ও তো মশাই বাংলা লাভ, ওর ট্যাক্স দিতে সবার দুঃখ হয়। আর আমার এই ট্যাক্সে, যে ট্যাক্স দেয় আর যে নেয়, দু'জনেরই আনন্দ।'

ক্যালেন্ডার দেখে মিলি বলল, 'গত মাসের ১৭ তারিখে ধানবাদ গিয়েছিল। ফিরেছে

২০ তারিখে।'

'তার মধ্যে কি একটা পূর্ণিমা পড়েছিল ?'

হ্যাঁ, পড়েছিল। তার জন্য ক্যালেন্ডার দেখার কোনও দরকার নেই। মিলির স্পষ্ট মনে আছে। রাত্রিবেলা বিছানায় একা একা শুয়ে ও পূর্ণিমার চাঁদ দেখেছিল। নিঃসঙ্গভাবে ছটফট করে কেটে গিয়েছিল রাতটা।

মিলি টেলিফোনে আলতো গলায় বলল, 'হ্যাঁ, ১৮ তারিখ পূর্ণিমা ছিল—'

চাপা হাসল লোকটা। খুকখুক করে দু'বার কেশে নিয়ে বলল, 'যা ভেবেছি তাই। সবটাই মিলে যাচ্ছে। মিসেস সেন, ২০ তারিখের খবরের কাগজে একটা ছোট্ট খবর বেরিয়েছিল। ধানবাদের তোপচাঁচি লেকের কাছে জঙ্গলে এক তরুণীর ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল—'

তার মানে ? কী বলতে চাইছে লোকটা ? সুনীতের ধানবাদ ট্যুর। পূর্ণিমা। তরুণীর ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ। এসবের মধ্যে কি কোনও সম্পর্ক আছে ?

'আপনি কী বলতে চাইছেন স্পষ্ট করে বলুন। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।' মিলির কথায় উদ্বেগ এবার প্রকট। আতঙ্কও যেন উঁকিঝুঁকি মারছে একটু-আধটু।

'আপনার দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই, মিসেস সেন।' লোকটার খসখসে স্বর কেমন ফিসফিসে শোনাচ্ছিল। যেন অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি তৈরি হচ্ছে টেলিফোনের ভেতরে। তারপর একটু হাসল—চাপা হাসি। বলল, 'আসলে ছোটবেলা থেকেই চাঁদ দেখলে চাঁদু কেমন যেন হয়ে যায়। মনে আছে, পূর্ণিমার রাতে ওকে বাড়িতে ধরে রাখা খুব শক্ত ছিল। খেয়ালখুশি মতো মাঠে-ঘাটে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। মানে, ওর কোনও দোষ নেই—তখন তো ওর আর কোনও জ্ঞান থাকে না।' একটু থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমরা সবাই ভেবেছিলাম, বড় হলে এসব সেরে যাবে—'

মিলি রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল। মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছিল। দেওয়ালে টাঙানো রহস্যময় জঙ্গলের ছবিটা ঝাপসা ঠেকছিল চোখে।

'মিসেস সেন ! মিসেস সেন, কী হল আপনার ? শুনছেন তো—'

ক্লান্ত স্বরে মিলি বলল, 'শুনছি—'

তখন কাশল লোকটা। থেমে থেমে বলল, 'আমরা ভাবলে কী হবে, চাঁদুর অসুখটা সারেনি। বছর চারেক আগে আমরা চার বন্ধু মিলে বাদুর এক বাগানবাড়িতে পিকনিক করতে গিয়েছিলাম। চাঁদুও ছিল আমাদের সঙ্গে। রাতে আমরা সেখানে থেকে গিয়েছিলাম। সেটা অবশ্য পূর্ণিমার রাত ছিল না। বোধহয় পূর্ণিমার তিন-চারদিন আগেই হবে। রাতে আমাদের একটু নেশা-টেশা হয়ে গিয়েছিল। বুঝতেই পারছেন, পিকনিক তো—। যাই হোক, রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ হঠাৎ খেয়াল হল, চাঁদু আমাদের সঙ্গে নেই। ওর অসুখের ব্যাপারটা একমাত্র আমিই জানতাম—মানে, জানি। তাই আসর ছেড়ে উঠে বাইরে বেরোলাম ওর খোঁজে।' কিছুক্ষণ চুপ করে রইল লোকটা। তারপর আবার কথা বলল, 'বাইরে বেরোতেই দেখি চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে বিশাল বাগান। বড় বড় গাছ সেখানে। এর মধ্যে কোথায় খুঁজব ওকে ! জোরে বাতাস বইছে, অন্ধকার গাছগুলো নড়ছে এদিক-ওদিক। সত্যি বলতে কি মিসেস সেন, আমার কেমন যেন গা ছমছম করতে লাগল। আর তখনই ওই অন্ধকার গাছপালার আড়াল থেকে একটা অদ্ভুত গর্জন ভেসে এল। এরকম গর্জন আমি আগে কখনও শুনিনি। সিনেমাতেও না। আমার বুকের ভেতরটা হঠাৎই কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমি ছুটে ঢুকে পড়লাম বাড়ির

ভেতরে। দরজায় ছিটকিনি এঁটে দিলাম। চাঁদুর জন্যেও কেমন ভয় করছিল আমার। ও বাইরে রয়েছে—যদি কিছু হয়...'

মিলির গলা দিয়ে একটুকরো তীক্ষ্ণ শব্দ বেরিয়ে এল। ভয়ের শব্দ। ওর রিসিভার ধরা হাতটা যেন অবশ। আর রিসিভার চেপে ধরা বাঁ কানটা গরম হয়ে গেছে আগুনের মতো। কেউ একটু একটু করে গলানো সীসে ঢেলে দিচ্ছে কানের ভেতরে। মিলির মনে হল ওর পা দুটোও যেন অল্প অল্প কাঁপছে।

ওর চাপা চিৎকারের টুকরোটা অবধারিত টেলিফোনের ও-প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। কারণ লোকটা বলল, 'ভয় পাবেন না, মিসেস সেন। এখন তো ভয় পেয়ে লাভ নেই! এখন আপনিই চাঁদুর একমাত্র আশা-ভরসা। আপনিই ওকে সারিয়ে তুলতে পারেন। যাই হোক, শুনুন, তারপর কী হল—। ভোরবেলায় বাড়ির দরজায় ধাক্কা দেবার শব্দ। খুলে দেখি চাঁদু। চুল উসকোখুসকো, মুখে ক্লান্তি, ঠোঁটে হাসি।'

মিলির বুক ঠেলে স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

লোকটা হাসল খুকখুক করে। তারপর বলল, 'সেদিন বেলার দিকে কী কৌতূহল হওয়ায় আমি বাগানের ভেতরে ঢুকেছিলাম। অনেকটা ভেতরে, একটা লিচু গাছের গোড়ায় একটা কুকুর মরে পড়ে ছিল। জানোয়ারটার মাথাটা অক্ষত ছিল বলে চিনতে পেরেছিলাম। নইলে বাকি শরীরের যা অবস্থা তাতে শুধু রক্ত-মাংস ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। একেবারে ফালা-ফালা করে শেষ করেছে।'

মিলি কোনওরকমে বলল, 'এসব কী বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কুকুরটাকে কে অমন করে মারল?'

লোকটা রহস্য করে বলল, 'সেটা আপনিই বলুন। আগের দিন ওই কুকুরটাকেই আমি বাগানবাড়িতে ঘোরাফেরা করতে দেখেছিলাম।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'গত মাসের ২০ তারিখের খবরের কাগজ পড়ে আমার ওই কুকুরটার কথা মনে পড়েছিল, মিসেস সেন। আসলে পূর্ণিমার সময়ে ওর অসুখটা যে ভীষণ বেড়ে যায়...'

মিলি জিগ্যেস করল, 'এই অসুখের জন্যে কখনও ও ডাক্তার দেখায়নি?'

'না। দেখাতে রাজি হয়নি। অসুখের ঘোর কেটে গেলে ওর কোনও ঘটনাই আর মনে পড়ে না। আর...আর ওর ধারণা হয়েছিল চাঁদু নামটার মধ্যেই কোনও গোলমাল আছে। মানে, ওই চাঁদের ব্যাপারটার জন্যে। সেইজন্যেই হয়তো নাম পালটেছে।' হাসল বেশ জোরে। বলল, 'এমন বোকা! ভেবেছে শুধু নাম পালটালেই ওর অসুখ সেরে যাবে! লাইক্যানথ্রপি কি অত সহজে সারে!'

'লাইক্যানথ্রপি!' খানিকটা অবাক হয়েই অচেনা শব্দটা উচ্চারণ করে মিলি। এরকম কোনও অসুখের নাম তো ও জীবনে কখনও শোনেনি!

লোকটা হেসে বলল, 'আজ রাখছি, মিসেস সেন। কাল আবার ফোন করব। কিন্তু মনে থাকে যেন, চাঁদুকে কিছু বলবেন না। আর ওকে একটু নজরে নজরে রাখবেন—'

টেলিফোন রেখে দিল লোকটা।

মিলির বুকের ভেতরে একশোটা তীব্র ঝড় বেপরোয়া খেলা খেলছিল। ওর মন ঠিকঠাক কাজ করছিল না। ও ঝাপসা নজরে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল জঙ্গলের ছবিটার দিকে। জঙ্গলটা কখনও বাদুর সেই বাগানবাড়ির বাগান বলে মনে হচ্ছিল, কখনও বা তোপচাঁচির জঙ্গল হয়ে যাচ্ছিল। এখন কী করবে মিলি? কী করা উচিত ওর?

নিজেকে শান্ত করার জন্য কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইল মিলি। তারপর ফ্রিজের কাছে

এল। ঠাণ্ডা জলের বোতল বের করে ঢকঢক করে খেল খানিকটা। একটা বড় শ্বাস বেরিয়ে এল বুক ঠেলে। বোতল রেখে ফ্রিজ বন্ধ করে চলে এল শোবার ঘরে। নরম বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। আকাশের ঘোলাটে আলো এসে পড়ল ওর মুখে। এখন সবে দুটো চল্লিশ। সুনীতের ফিরতে অনেক দেরি। ততক্ষণ কি ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা ভেবে দেখলে হয় না?

মিলির ডান হাতটা এলিয়ে পড়েছিল সুনীতের বালিশের ওপরে। একটা প্রিয় ঘ্রাণ নাকে এল মিলির। মনে পড়ে গেল কাল রাতের কথা। অষ্টোত্তর শতনামের খেলার কথা।

রাত তখন প্রায় এগারোটা। ঘর অন্ধকার। শোবার ঘরের কাচের দেওয়াল পেরিয়ে দ্বাদশীর চাঁদের আলো এসে পড়েছে বিছানায়, ওদের গায়ে। আকাশে তাকিয়ে মনেই হয় না সন্ধে পর্যন্ত সেখানে বাদল মেঘের খেলা ছিল।

মিলিকে আলতো করে টেনে পাশ ফেরাল সুনীত। দু'-হাতের চেটোয় ওর মুখটা ধরে বলল, 'তোমাকে এখন একটা পুরনো কথা শোনাব। প্রায় কয়েক লক্ষ বছরের পুরনো।'

'কী?'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি।' বলে হাসল শব্দ করে। মিলির নাকের ডগায়, চোখের পাতায় আর কপালে চুমু খেল। বলল, 'আমার বিশ্বাস, মানুষ যেদিন প্রথম ভাষা তৈরি করেছিল সেদিন তার প্রথম কথা ছিল এই তিনটে পুরনো শব্দ। লক্ষ বছরেও এদের ধার কমেনি। আসছে লক্ষ বছরেও কমবে না। এটাই হচ্ছে সুনীত সেনের প্রথম সূত্র।'

'তোমার এরকম আর কী কী সূত্র আছে শুনি?'

'অনেক। তবে এখন আর একটা সূত্র শুধু বলব—'

'কী?'

'চাঁদনি রাতে বিছানায় শুয়ে বেশিক্ষণ দূরে দূরে থাকতে নেই।' বলেই মিলিকে একেবারে জাপটে ধরল সুনীত।

ঠিক সেই মুহূর্তেই সুনীতের কাঁধের ওপর দিয়ে আকাশের চাঁদের দিকে চোখ পড়ল মিলির। টেলিফোনের লোকটার কথা মনে পড়ল। আর তখনই, ওই ভালোবাসাবাসির মধ্যেই, ওর ঠোঁট চিরে বেরিয়ে এল ভয়ঙ্কর শব্দটা।

'চাঁদু!'

চমকে উঠল সুনীত। ভালোবাসায় তাল কেটে গেল। মিলিকে সামান্য ঠেলে দিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকাল ও।

'চাঁদু! চাঁদু মানে?'

মিলির বুকের ভেতর একটা ধাক্কা মারল কেউ। কষ্ট করে হাসল ও। বলল, 'চাঁদু নামটা তোমার কেমন লাগে?'

'বিচ্ছিরি।' ঠোঁট বেঁকাল সুনীত। জিগ্যেস করল, 'হঠাৎ এই নামটা এ-সময়ে তোমার মাথায় এল কেন?'

'চাঁদ দেখতে দেখতে।' একটু থেমে আরও বলল, 'তাছাড়া অনেকের অদ্ভুত সব ডাকনাম থাকে না...। যেমন, আমার নাম ছিল ভূতি, মান্তু, সুন্দরী।'

মিলির মনে হল সুনীত আবার স্বাভাবিক হয়েছে। কারণ ওর মুখে শেষ নামটা শুনে বলল, 'এই শেষ নামটাই আমার সবচেয়ে পছন্দ—'

'তোমার কী কী ডাকনাম ছিল?'

'সে তো তুমি জানো—সুনু। তাছাড়া ছোটবেলায় বন্ধুরা সন্তু বলে ডাকত...'

'আর কোনও নাম ছিল না?'

'না।' একটু চুপ করে থেকে আবার জিগ্যেস করল, 'কেন, হঠাৎ নামের খোঁজ কেন?'

হাসল মিলি। বলল, 'মেয়েদের সব কথায় কেন জিগ্যেস করতে নেই—'

'বা রে! বেশ মজা তো!'

'হ্যাঁ, মশাই। এটাই হল মিলি সেনের প্রথম সূত্র।'

ওরা দু'জনেই হেসে উঠল। তারপর সুনীত বলল, 'যাকগে, এসব বাদ দাও। আমার দ্বিতীয় সূত্রটা মনে আছে তো?'

'ও বাব্বা, সে আবার মনে থাকবে না!'

'তাহলে আর দেরি করছ কেন?'

তারপর চাঁদকে সাক্ষী রেখে ওরা যা-খুশি-তাই শুরু করেছে। আনন্দে উথাল-পাথাল মিলি তখন কিছুতেই টেলিফোনের লোকটাকে আর মনে করতে পারেনি।

কিন্তু এখন? এখন তো টেলিফোনের লোকটাই সবচেয়ে বেশি সত্যি। লোকটার কথাগুলোও কি সত্যি? সুনীতকে এই আড়াই বছরে ঠিকমতো চিনতে পারেনি মিলি? রুচিবান, সুদর্শন, সফল ব্যবসায়ী ওই যুবকের আড়ালে লুকিয়ে আছে অন্য এক পরিচয়?

এই প্রশ্নটা যখন মাথায় এল তখন মিলির চোখ পড়ল দেওয়ালে টাঙানো একজোড়া ফটোর দিকে। ওর আর সুনীতের ছবি। একটা বিয়ের আগে তোলা। অন্যটা বিয়ের পরের। ওর মনে পড়ল লোকটার গতকালের কথা: 'ও কখনও বিয়ে করবে ভাবিনি...'

আচ্ছা, ২০ তারিখের খবরের কাগজটা খুঁজে দেখলে কেমন হয়! ফটোজোড়ার খানিক নীচেই দেওয়াল-ক্যাবিনেট। তার নীচের খোলা তাকে জমানো রয়েছে পুরনো খবরের কাগজ। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' আর 'দ্য স্টেট্সম্যান'। ওর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে কি সেই দরকারি কাগজটা?

ক্যাবিনেটের কাছে গিয়ে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল মিলি। তারপর দ্রুত হাতে খুঁজতে লাগল ২০ তারিখের খবরের কাগজ: বাংলা, অথবা ইংরেজি।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর ইংরেজি কাগজটা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু বাংলার হদিস মিলল না। কে জানে, হয়তো রান্নাঘরের বা কোনও ক্যাবিনেটের তাকে পাতার জন্য সেটা ব্যবহার করা হয়েছে। কিংবা, রুমি ঘর ঝাঁট দিয়ে ময়লা ফেলার কাজে লাগিয়েছে।

সুতরাং ইংরেজি কাগজটা নিয়েই হুমড়ি খেয়ে পড়ল মিলি। তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল তোপচাঁচির দুর্ঘটনার খবর। কোথায় সেই ছোট্ট খবরটা?

না, নেই। 'দ্য স্টেট্সম্যান' পত্রিকায় খবরটা বেরোয়নি। মিলি যখন খানিকটা অসহায় তখনই ওর মনে পড়ল, টেলিফোনে লোকটা ওকে শুধু খবরটার কথাই বলেছে, খবরের কাগজের নাম বলেনি। এখন আন্দাজে কোন কাগজ খুঁজবে ও?

খানিকটা হতাশ হয়েই পুরনো কাগজের স্তূপ আবার গুছিয়ে রাখতে লাগল মিলি। ঠিকঠাক করে গুছিয়ে না রাখলে সুনীত আবার এসে বিরক্ত হবে।

হাতের কাজ শেষ হতেই মিলির মনে হল 'লাইক্যান্‌থ্রপি' শব্দটার কথা। এরকম অদ্ভুত অসুখের নাম ও জীবনে কখনও শোনেনি। উঠে দাঁড়িয়ে বইয়ের তাকের কাছে গেল মিলি। বের করে নিল ইংলিশ-টু-বেঙ্গলি ডিকশনারি। পাতা উলটে চলে গেল নির্দিষ্ট জায়গায়। চঞ্চল চোখে খুঁজল। না, নেই। অবশ্য না থাকাটাই স্বাভাবিক। কত

কঠিন কঠিন অসুখ রয়েছে। তার সব নামই কি ডিকশনারিতে থাকে ?

মিলির মনে হল, কোনও ডাক্তার হয়তো এই অসুখের ব্যাপারে বলতে পারবে। ওদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ডক্টর বোস সন্ধে ছ'টা থেকে বিডন স্ট্রিটের চেম্বারে বসেন। ওঁকে ফোন করে জিগ্যেস করলে কেমন হয় ? ওদের পুরনো প্রেসক্রিপশান একটা ফাইলে গাঁথা থাকে। মিলি তারই একটায় চোখ বুলিয়ে দেখে নিল চেম্বারের ফোন নম্বরটা। এখন, দুপুর তিনটের সময়ে, ডক্টর বোসের বাড়িতে ফোন করার কোনও মানে হয় না।

ঠিক এই সময়ে টেলিফোনটা বেজে উঠতেই প্রায় আঁতকে উঠল মিলি।

শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখটা একবার মুছে নিয়েই তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল টেলিফোনের কাছে। ভয়ে ভয়ে রিসিভার তুলে বলল, 'হ্যালো'—'

'কে, ভূতি ?'

সুনীত !

পলকে সহজ হয়ে হাসল মিলি। এই সুনীত কখনই চাঁদু হাতে পারে না। কত উচ্ছল, কত সুন্দর !

'ইয়ারকি হচ্ছে ! আমার আর নাম নেই !' মিলি রাগের সুরে বলল।

'ঠিক আছে। নতুন করে শুরু করছি আবার। কে, মান্ত ?' সুনীত তখন মজা করে হাসছে।

'ইয়ারকি ছেড়ে কাজের কথা বলো। কেন ফোন করছ ?'

'বাব্বাঃ ! কী সিরিয়াস ! আমিও তাহলে সিরিয়াস হই।' একটু থেমে আবার বলল, 'অ্যাই, শোনো। আজ সন্ধেবেলা যখন ফিরব তখন আমার সঙ্গে গৌতম থাকবে। ওর সঙ্গে একটা বিজনেস ডিল নিয়ে আলাদা কথা আছে—অফিসে সে-কথা হবে না। তুমি খাবার-দাবারের কিছু ব্যবস্থা কোরো—'

'আচ্ছা। কিন্তু তুমি ফিরছ ক'টায় ?'

'এই সাড়ে ছ'টা সাতটা—' কথাটা বলেই ফোন ছেড়ে দিতে যাচ্ছিল সুনীত। মিলি সেটা বুঝতে পেরেছিল। তাই তাড়াহুড়ো করে বলে উঠল, 'শোনো—'

'কী ?'

'লাইক্যানথ্রপি কথাটার মানে জানো ?'

অবাক হয়ে শব্দটা আওড়াল সুনীত, 'লাইক্যানথ্রপি ?' তারপর বলল, 'নাঃ, এরকম বিদঘুটে শব্দ বাপের জন্মে শুনিনি।' একটু থেমে আবার : 'তা তুমি এই বিদঘুটে শব্দ নিয়ে পড়েছ কেন ?'

একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল মিলি। এতটা কৌতূহল না দেখালেই হয়তো ভালো হত। ও সহজ সুরে বলার চেষ্টা করল, 'না, আমার একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের একবার এই লাইক্যানথ্রপি হয়েছিল। এটা একটা অসুখ—'

'নির্ঘাৎ বিদঘুটে কোনও অসুখ। আচ্ছা, রাখছি—'

ফোন ছেড়ে দিল সুনীত। আর মিলি খেয়াল করল, ওর ঘাড়ে গলায় কপালে ঘাম জমেছে। অথচ সিলিং ফ্যান দিব্যি ঘুরছে মাথার ওপরে।

গৌতম আগেও মিলিদের বাড়িতে এসেছে। সুনীতের অনেকদিনের বন্ধু। কলেজে একসঙ্গে পড়ত ওরা দু'জনে। গৌতমদের এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের ব্যবসা। ইলেকট্রনিক

কম্পোনেন্ট বা টেলিভিশন-টেপরেকর্ডার সব কিছুই ওদের ব্যবসার আওতায় পড়ে। সুনীতের ব্যবসা দাঁড় করাতে গৌতম কম মেহনত করেনি। বলতে গেলে কলেজ জীবনের এই বন্ধুকে ও-ই ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টের ব্যবসায় নামিয়েছে। ব্যবসা নিয়ে আলোচনার জন্য বা স্রেফ আড্ডা মারতে গৌতম কয়েকবার এসেছে এই ফ্ল্যাটে। ব্যাচিলার ফুর্তিবাজ ছেলে।

সোফায় আরাম করে বসে চা খেতে খেতে কথা বলছিল ওরা তিনজনে। গৌতম সুনীতকে ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে কী একটা বলছিল।

হঠাৎই গৌতম মিলির দিকে তাকিয়ে বলল, 'বউদি, আপনি ওকে বলে একটু রাজি করান। আমার কথা কিছুতেই শুনছে না।'

মিলি দেখল সুনীতের দিকে। জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার?'

সুনীত চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'বাদ দাও তো, ও আমাদের বিজনেসের ব্যাপার—'

মিলি গৌতমকে বলল, 'সরি, গৌতমদা, বিজনেসের মধ্যে আমি নেই। ও তো প্রায়ই আমাকে খোঁচা দিয়ে বলে, মেয়েরা আবার ব্যবসা বুঝবে কী?' হাসল মিলি। গৌতমও হাসতে চেষ্টা করল।

মিলি গৌতমকে দেখছিল, ময়লা রং, স্বাস্থ্য ভালো, চুল পাতলা, চোখ গভীর। একটু লাজুক ধরনের ছেলে। মিলির সঙ্গে সহজ হতে ওর প্রায় ছ'মাস লেগেছে। অথচ ওদের ব্যবসার কাজে ওকে প্রায়ই হংকং, সিঙ্গাপুর, জাপান, আমেরিকা উড়ে বেড়াতে হয়। কিন্তু ওর চেহারায় সেই আলগা ঠাটবাটের ছাপ পড়েনি।

গৌতম চা শেষ করে সুনীতের কাছ থেকে সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরাল। বার দুয়েক ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'সুনীত, আমার একটা কথা শোন। তুই এই লটটার অর্ডার করিয়ে দে, প্লিজ। নইলে আমার প্রায় তিন লাখ টাকা লোকসান হয়ে যাবে। তোকে আর কখনও বলব না।'

সুনীত ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ কী ভেবে বলল, 'এ হয় না। তোকে তো তিনদিন ধরে একই কথা বলছি। এরকম দু'নম্বরী আমি করতে পারব না। আমাকে জিগ্যেস করে কি তুই মাল তুলেছিলি! এমনি কী হেল্প চাস বল, জান দিয়ে করব। আমি তোর কাছে গ্রেটফুল—'

মিলি চায়ের কাপে আনমনা চুমুক দিচ্ছিল। ডক্টর বোসকে ও ফোন করেছিল ছুটির সময়ে। উনি লাইক্যানথ্রপি অসুখটার ব্যাপারে কিছুই বলতে পারেননি। তখন পাশের ফ্ল্যাটের কেজরিওয়ালদের ফ্ল্যাটে গিয়ে বড় ডিকশনারি ধার চেয়েছে। পায়নি। না পাওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ কেজরিওয়ালদের দুই পুরুষ ধরে শেয়ার মার্কেটে শেয়ার বেচাকেনার ব্যবসা।

সুনীতের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল মিলি। মুখের প্রতিটি রেখা খুঁটিয়ে দেখছিল। আর শুনছিল দু'-বন্ধুর কথা।

গৌতম বিদেশ থেকে প্রায় তিন লাখ টাকার ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট আমদানি করেছে। যে-টিভি কোম্পানির কথা ভেবে কম্পোনেন্টগুলো ও আনিয়েছিল, তারা ইতিমধ্যে টিভির মডেল পালটে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নতুন মডেলে গৌতমের কম্পোনেন্ট কাজে লাগবে না। সুতরাং গৌতমের মাথায় হাত। এখন ও নতুন খদ্দের পাবে কোথায়? সুনীতের সঙ্গে ওই টিভি কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরের খুব মহরম

মহরম। সুনীত একবার বলে দিলেই ওরা গৌতমের মালটা কিনে নিতে পারে। চালু পুরনো মডেলের টিভি বাজারে তিন চার মাস রেখে তারপর নতুন মডেল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

কিন্তু সুনীত বলতে রাজি নয়। ওর কথা হল : 'একবার এরকম সুবিধে চাইলে আমাকেও তার বদলে কোনও সুবিধে ওদের দিতে হবে। ওদের সঙ্গে আমার এখন আর বিজনেসের লেনদেন নেই। তাহলে ফেভারটা ফেভার দিয়ে শোধ করব কেমন করে ?'

গৌতম অনুনয়ের সুরে বলল, 'তুই তিনদিন ধরে সেই এক গোঁ ধরে বসে আছিস। বন্ধুর জন্যে এটুকু করতে পারবি না ?' সুনীতকে চুপ করে থাকতে দেখে গৌতম মিলিকে বলল, 'বউদি, আপনিই মাইরি আমার লাস্ট ভরসা—'

মিলি হেসে বলল, 'আমি হেল্পলেস, গৌতমদা। আর এক কাপ চা চাইলে খাওয়াতে পারি, তবে—'

পাখির ডাক শোনা গেল। কলিংবেল বাজিয়েছে কেউ। রুমিকে ডেকে দরজা খুলতে বলল মিলি। তারপর সোফা ছেড়ে উঠে দেখতে গেল কে এসেছে।

অচেনা একজন লোক দরজায় দাঁড়িয়ে। রুক্ষ চাউনি। এলোমেলো চুল। ইস্তিরিহীন জামা-প্যান্ট। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। সামনের দুটো দাঁত একটু উঁচু। তবে দেখে ধূর্ত বলে মনে হয়।

'মিস্টার সেন আছেন ?'

'হ্যাঁ, আছেন। আপনি ?'

'আমার নাম মণিময় পাত্র। উনি আমাকে চেনেন—আমি ওঁর অফিসের স্টাফ।'

'ভেতরে আসুন—'

মিলির প্রায় পিছন পিছন ঘরে ঢুকে পড়ল আগন্তুক। রুমি আবার চলে গিয়েছিল রান্নাঘরে। মিলি ভাবছিল মেয়েটাকে আর এক কাপ চায়ের কথা বলবে কি না, কিন্তু ঠিক তখনই সুনীত দেখতে পেল মণিময় পাত্রকে। পলকে বিরক্তির ছাপ পড়ে গেল ওর মুখে। চোয়াল শক্ত করে উঠে দাঁড়াল ঝট করে।

'কী ব্যাপার, আপনি বাড়িতে এসেছেন কেন ?'

মণিময় বিব্রতভাবে হাত কচলাতে লাগল। মুখের ভাব একেবারে পালটে ফেলেছে। কোথায় উধাও হয়ে গেছে একটু আগের সেই রুক্ষ চাউনি। তার বদলে এখন গদগদ ভাব।

'আমার বাড়ির ঠিকানা আপনি কোথায় পেলেন ?' সুনীত ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল।

মণিময় আমতা আমতা করে উত্তর দিল, 'রাগ করবেন না, স্যার। বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। বিশ্বাস করুন, স্টোর থেকে একটা আই. সি.-ও আমি নিইনি—'

'আমার বাড়ির ঠিকানা আপনি কোথায় পেলেন ?' এই হিমশীতল ঠাণ্ডা গলা কি সুনীতের ? অবাক হয়ে ভাবল মিলি।

মণিময় পাত্র বলল, 'অফিস থেকে জোগাড় করেছি, স্যার—কিছু মনে করবেন না। আমি চোর নই। আমার ফ্যামিলিতে কখনও কেউ চুরি করেনি। ওই চুরির ব্যাপারে মিথ্যে আমার নাম জড়িয়েছে, স্যার।'

সুনীত হাতের সিগারেটটা গায়ের জোরে গুঁজে দিল অ্যাশট্রেতে। তারপর বসে থাকা মিলি আর গৌতমকে পাশ কাটিয়ে পৌঁছে গেল মণিময়ের কাছে। ওর মুখে এতগুলো

নিষ্ঠুর পেশি আগে কখনও মিলির নজরে পড়েনি।

'মিস্টার পাত্র, ব্যাপারটা এখন পুলিশ দেখছে—তারাই ঠিক করবে কে চুরি করেছে, কে করেনি। আপনার ফ্যামিলিতে কেউ কখনও চুরি করেনি বলছেন। কিন্তু একজনকে তো সবসময় শুরু করতে হয়। হতে পারে আপনার ওপরেই সেই দায়িত্বটা পড়েছে—' একটু থেমে আরও বলল, 'হয়তো বা অন্য কারও ওপরে। সেটা পুলিশকেই বের করতে দিন। এখন আমি আপনাকে যুধিষ্ঠির সার্টিফিকেট দিলেও পুলিশ মেনে নেবে না।' সুনীতের মুখচোখ রাগে থমথম করছে।

মণিময় মনোযোগ দিয়ে সুনীতের কথা শুনছিল। অপমানও হজম করছিল। আর একই সঙ্গে ওর মুখের নরম গদগদ ভাবটা পালটাচ্ছিল। সুনীতের কথা শেষ হতে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'ঠিক আছে। আমাকেও তাহলে মুখ খুলতে হবে। আমিও লুকনো খবর কিছু কম জানি না, স্যার। আচ্ছা, নমস্কার।'

ব্যঙ্গের চাউনি আর নমস্কার ছুড়ে দিয়ে চলে গেল মণিময়। মিলি উঠে গেল দরজা দিয়ে আসতে। ফিরে এসে সুনীতকে জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার বলো তো?'

সুনীত জঙ্গলের ছবিটার দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে ছিল। বলল, 'মণিময়বাবু আমার স্টোর সুপারভাইজার। দিন দশেক আগে স্টোরে চুরি ধরা পড়েছে। তিরিশ হাজার টাকার আই. সি. চিপের হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না।' একটু থেমে বলল, 'তাই গত সপ্তাহে ওঁকে সাসপেন্ড করেছি। পুলিশ ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখছে—'

এরপরই সন্ধের সুর কেটে গেল।

গৌতম চলে গেল একটু পরেই। যাওয়ার আগে মিলির সঙ্গে ঠাট্টা করে গেল। বলে গেল, 'বউদি, আপনি আমার উকিল। দেখুন যদি ওকে নরম করে রাজি করাতে পারেন।'

মিলি হেসে এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে বলেছে, 'সরি গৌতমদা, পাথরে মাথা কুটলে আমার মাথাই শুধু ব্যথা করবে। চেনেন না তো ওকে—'

গৌতম চলে যেতেই কাপ-প্লেট-অ্যাশট্রে সরিয়ে ড্রইং-কাম-ডাইনিং স্পেস গুছিয়ে ফেলল মিলি। তারপর রান্নাঘরে গেল রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু ওর মনে লাইক্যানথ্রপি শব্দটা তখনও খচখচ করতে লাগল।

রান্নার কাজ শেষ করে রুমিকে খেতে দিয়ে শোবার ঘরে এল মিলি। দেখল ঘর অন্ধকার। সুনীত বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে। গ্রিল আঁকড়ে ধরে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। চাঁদের দিকে। ওকে দেখে হঠাৎই মিলির মনে হল, বন্দি কোনও মানুষ আকুলভাবে চাঁদকে কাছে পেতে চাইছে।

ও বারান্দায় গেল। আলতো করে হাত রাখল সুনীতের পিঠে। সুনীতের শরীর পলকের জন্য কেঁপে উঠল।

'কী দেখছ?' জিগ্যেস করল মিলি।

সুনীত ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, 'আকাশ দেখছি। চাঁদ দেখছি। বিনি পয়সায় এরকম সুন্দর দৃশ্য কোথায় পাবে বলো—'

মিলি ফস করে বলে বসল, 'তোপচাঁচির লেক থেকে চাঁদ দেখতে দারুণ লাগে শুনেছি। কলেজে পড়ার সময় একবার বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল। আমি অবশ্য যাইনি।'

সুনীত কিছু বলল না। আবার চোখ ফেরাল আকাশের দিকে। ত্রয়োদশীর চাঁদের দিকে তাকিয়ে মিলির মনে পড়ল পরশু পূর্ণিমা।

'তুমি তোপচাঁচিতে গেছ কখনও ?'

সুনীত ওর দিকে না তাকিয়েই বলল, 'না, যাইনি—'

'তুমি তো গত মাসে ধানবাদে ট্যুরে গিয়েছিলে, তখন যেতে পারতে—'

সুনীত এবার তাকাল। ওর গলার স্বর শক্ত হল : 'আমি বেড়াতে যাইনি। বিজনেস ট্যুরে গিয়েছিলাম।'

মিলির মধ্যে কেমন একটা জেদ চেপে গেল। ও বলল, 'তুমি আবার কবে ট্যুরে যাবে ?' একটু থেমে, 'মানে বিজনেস ট্যুরে ?'

'সামনের মাসে হয়তো যাব। দেখি।' মিলির দিকে পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়াল সুনীত। ওর মাথার পাশ দিয়ে চাঁদ দেখতে পাচ্ছিল মিলি। সুনীত একটু গাঢ় গলায় জিগ্যেস করল, 'কেন, তুমি যাবে আমার সঙ্গে ?'

টেলিফোনের লোকটার কথা মনে পড়ল : '...ওকে একটু নজরে নজরে রাখবেন...'

সুতরাং মিলি বলল, 'যদি যাই ?'

নির্লিপ্ত গলায় সুনীত জবাব দিল, 'যেয়ো—'

আবার কোথায় যেন সুর কেটে গেল বুঝতে পারল মিলি। ও বারান্দা ছেড়ে চলে এল ভেতরে। রুমিকে শুয়ে পড়তে বলে ডাইনিং টেবিলে ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগল।

সে-রাতে খেতে বসে চুপচাপ ওরা টিভি দেখল। তারপর শোবার আগে ঘর আবছা অন্ধকার করে শাড়ি ছেড়ে ম্যাক্সি পরে নিল মিলি। সুনীত বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে। ডান হাত দিয়ে চোখ আর কপাল ঢাকা।

মিলি টেপ-ডেকে ওর পছন্দের রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজিয়ে দিল। সুরেলা গলায় সুমিত্রা সেন গাইছিলেন : গোপন কথাটি রবে না গোপনে...।

১৬ তারিখ দুপুরে টেলিফোন এল আবার।

ক্যালেন্ডারে নজর রেখেছিল মিলি। আজই পূর্ণিমা। ওর মনের ভেতরে এক অদ্ভুত টান ধরছিল। যেন অসংখ্য বীণার তার অসহ্য টানে বাঁধা। আর একটা ভয়ঙ্কর হাত আচমকা আঙুল বাঁকিয়ে টান মারছে সেই তারে। সুরের বদলে বিষ উঠছিল সেই ঝঙ্কারে।

গতকাল কোনও ফোন আসেনি।

না, কথাটা ঠিক হল না। ফোন এসেছে কয়েকটা। কিন্তু যে-ফোনের জন্য সারাটা দিন মিলি ছটফট করে অপেক্ষা করেছে, সেই ফোন আসেনি। কেউ খসখসে চাপা গলায় বলেনি : 'হ্যালো, মিসেস সেন—কেমন আছেন ?'

আজ, এখন, বলছে। সেই একই স্বর, সেই একই রকম সম্মোহনের সুর।

কালকের দিনটা যে কী সাঙ্ঘাতিক অবস্থায় কেটেছে মিলির! বুকের ভেতরটা কেমন ধড়ফড় করছিল। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল মাঝে মাঝেই। আর মাথা ঝিমঝিম করছিল।

কাল আর পরশু রাতে অনেক খারাপ স্বপ্ন দেখেছে ও। মাঝরাতে হঠাৎ হঠাৎ করে জেগে উঠেছে। তখন বুকের মধ্যে কেউ পাথর ভাঙছিল। আর সারা শরীরে কুলকুল ঘাম। নিজের অজান্তেই ওর চোখ চলে গেছে আকাশের দিকে। সেখানে মেঘের আস্তরে ঢাকা মলিন চাঁদ ঢলে পড়েছে।

তখন ঘুমন্ত সুনীতের দিকে তাকিয়েছে মিলি। খালি গা। পাশ ফিরে শুয়ে আছে। বুকভর্তি লোম। হাতে-পায়েও কম নয়। সুনীত বলে, এগুলো নাকি পুরুষ-সিংহের পরিচয়। এখন সেই পুরুষ-সিংহের মাথার কোঁকড়া চুলে, মুখে, গায়ে মরা চাঁদের আলো এসে পড়েছে। দেখে মনেই হয় না, এর কোনও অসুখ আছে।

বিছানা ছেড়ে বাথরুমে গেছে মিলি। তারপর ঢকঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে আবার ঘুমনোর চেষ্টা করেছে। ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুম এসেছে। সেইসঙ্গে দুঃস্বপ্ন। বাদুর বাগানবাড়ির মাটিতে একটা অসহায় কুকুরকে দুটো হাত ছিন্নভিন্ন করছিল। আর তারপর দেখেছে তোপচাঁচির ভয়ঙ্কর ঘটনা।

এইভাবে গত দুটো রাতে বারবার ঘুম ভেঙেছে মিলির। শরীর অস্থির। গলা শুকিয়ে কাঠ।

তারপর কাল সারাটা দিনও কেটেছে অস্থিরভাবে।

সকালে কিংবা অফিসে বেরোনোর সময়ে সুনীতের সঙ্গে বেশি কথা বলেনি। সুনীতকেও কেমন অন্যরকম লাগছিল। মিলির চোখে চোখ পড়লেই নজর সরিয়ে নিতে চাইছিল। অথচ মাঝে মাঝে আড়চোখে দেখছিল ওকে।

রুমি মেয়েটা দেখতে বেশ। আর স্বভাবটাও মিষ্টি। কিন্তু কী হয়েছে মিলির! কাল সারাদিন খিটখিট করেছে মেয়েটাকে। এমনকি রুমির মাকেও রেহাই দেয়নি।

আজ সকালে সুনীত যখন অফিসে বেরোয়, তখন রোজকার মতো মিলি জানতে চেয়েছে : 'কখন ফিরবে?'

সুনীত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো বেশবাস দেখে নিচ্ছিল। মিলির দিকে না তাকিয়েই নির্লিপ্ত জবাব দিয়েছে, 'যখন ফিরি—'

মিলি আর কিছু জিগ্যেস করেনি। ওর মনের ভেতরে অনেকগুলো ঘুণপোকা বাসা বাঁধছিল। গত দুটো রাত ওকে কি সুনীতের কাছ থেকে আরও দূরে ঠেলে দিয়েছে? সুনীতের ভালোবাসার ডাকে কেন সাড়া দিতে পারছে না ও? কেন?

শাড়ির আঁচল দিয়ে বারবার মুখের ঘাম মুছছিল। কাকে বলবে ওর বিপদের কথা! এ-কথা কি কাউকে বলা যায়! মিলির বাবা, মা, দাদা আছে যাদবপুরে। মাঝে মাঝেই ফোনে কথা হয়। কিন্তু মাকেও তো বলা যায় না এই অসুখটার কথা! অন্তত এখনও। কী যে করা উচিত সেটা ভেবে ভেবেই অস্থির সময় কাটছিল মিলির। ঠিক তারই মাঝে এসেছে টেলিফোন। এই টেলিফোনের জন্য দু'দিন ধরে মিলি অপেক্ষা করেছে।

'হ্যালো, মিসেস সেন—কেমন আছেন?'

মিলির গলায় রবারের বল আটকে গেছে যেন। কোনও কথা বলতে পারল না ও।

'আবার ধন্যবাদ পাওনা আপনার—আমাদের সুনীতকে—মানে, চাঁদুকে কিছু বলেননি বলে।' একটু থেমে খসখসে হাসি। তারপর : 'যখন বলার সময় হবে, আমি জানিয়ে দেব। গতকাল আপনাকে ফোন করতে পারিনি। একটা কাজে ফেঁসে গিয়েছিলাম। এই দু'দিন অস্বাভাবিক কিছু আপনার নজরে পড়েছে?'

মিলি ইতস্তত করল কয়েক সেকেন্ড। তারপর বলল, 'ন্-না, তেমন কিছু টের পাইনি—'

'আজ পূর্ণিমা, মিসেস সেন।'

'জানি—' অবসন্ন গলায় বলল মিলি।

'আজকের রাতটাই ভয়ের। লাইক্যান্থ্রপির ধরনটাই যে এরকম—'

'এটা—এটা কী অসুখ ?' প্রশ্ন করতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল মিলির, 'ডিকশনারিতে তো এর নাম নেই—'

মজা পেয়ে চাপা হাসি হাসল লোকটা। বলল, 'ছোটখাটো সাধারণ ডিকশনারিতে এ-নাম পাবেন না। তবে বড় ইংলিশ-টু-ইংলিশ ডিকশনারিতে শব্দটা আছে। লাইক্যান্থ্রপিতে যে আক্রান্ত হয় তাকে লাইক্যান্থ্রোপ বলে। এটা এসেছে গ্রিক শব্দ লাইক্যান্থ্রোপোস থেকে। সেটা আবার এসেছে লাইকোস আর অ্যান্থ্রোপোস—এই দুটো শব্দ জোড়া দিয়ে। লাইকোস মানে নেকড়ে, আর অ্যান্থ্রোপোস হল মানুষ। নেকড়ে-মানুষ। ওয়্যারউল্ফ।'

'নেকড়ে-মানুষ!' বিড়বিড় করে বলল মিলি। মনে হল, ওর শিরদাঁড়া ক্রমশ নমনীয় হয়ে যাচ্ছে। এই সুদৃশ্য ফ্ল্যাট, রুমি, সুনীত, সামনের জানলা দিয়ে দেখতে পাওয়া বাইরের আকাশ, সবই কেমন অলীক হয়ে যাচ্ছিল। এক ভয়ঙ্কর অনুভবের মধ্যে ডুবে যেতে যেতে মিলি কোনওরকমে বলতে পারল, 'সুনীত নেকড়ে-মানুষ! তার মানে—'

'মিসেস সেন, মিসেস সেন—' সাপ কথা বলল ফিসফিস করে, 'এতটা আপসেট হবেন না, প্লিজ! এই লাইক্যান্থ্রপি যাদের হয়, কোনও কোনও সময়ে তাদের শরীরে একটা পরিবর্তন দেখা দেয়। সাময়িক পরিবর্তন। তারা কিছুক্ষণের জন্যে হিংস্র নেকড়ে হয়ে যায়।' একটু থেমে লোকটা আবার বলল, 'পূর্ণিমার সময়ে অসুখটা বড্ড বাড়াবাড়ি রকমের হয়—'

'আজ পূর্ণিমা...' মিলির ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে শব্দ দুটো আলতোভাবে বেরিয়ে এল।

'হ্যাঁ, তবে ভয় পাওয়ার বিশেষ কিছু নেই। শুধু একটু সাবধানে থাকবেন। আর...আর...'

'আর কী ?'

'ও যদি পূর্ণিমার চাঁদ না দ্যাখে তাহলে ভালো হয়।' একটু থেমে লোকটা আবার বলল, 'ছোটবেলায় চাঁদু প্রথমদিকে বেশ শান্তশিষ্ট চুপচাপ ছিল। একবার ওকে ওর মাসির কাছে রেখে ওর মা-বাবা চার-পাঁচদিনের জন্যে কোথায় যেন বেড়াতে গিয়েছিল। ফিরে এসে দ্যাখে চাঁদুর হাবভাব কেমন পালটে গেছে। সবসময় বায়না করছে, খিটখিট করছে, রেগে যাচ্ছে, হাতের কাছে যা পাচ্ছে ছুড়ে মারছে, আর খেপে গিয়ে জানোয়ারের মতো গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। ওর মাসির সামান্য একটু মাথার দোষ ছিল। ঝগড়া করত সবসময়। সকলে ভেবেছিল, মাসির কাছে ওই চার-পাঁচদিন থাকার সময় হয়তো দু'জনের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হয়ে থাকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা আর জানা যায়নি। তবে ওই দশ বছর বয়েস থেকেই চাঁদুর স্বভাব একেবারে পালটে গেল।

'এরপর একটা মজার ব্যাপার হল। একদিন বিকেলে ওদের বাড়িতে আমরা তিন-চারজন বন্ধু মিলে গল্পগুজব করছি, খেলা করছি, চাঁদু কোথা থেকে একটা ছবির বই নিয়ে এল—'

'ছবির বই ?'

'হ্যাঁ, নানা জন্তু-জানোয়ারের ছবি নিয়ে একটা গল্পের বই। তবে ছবি অনেক বেশি, লেখা কম। তা সেই বইয়ের মধ্যে একটা নেকড়ের ছবি ছিল। ছাইরঙা বিশাল নেকড়েটা পেছনের দু'-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছুটছে দূরের একটা জঙ্গলের দিকে। ছবিটা দেখেই চাঁদু ভয়ে চিৎকার করে উঠল। সে-চিৎকার আর থামে না। তারপর একটানে বইটা ছুড়ে ফেলে দিল দূরে। ব্যাপারটায় আমরা বেশ মজা পেয়েছিলাম। এরপর থেকে প্রায়ই

আমরা চাঁদুকে ওই ছবিটা দেখিয়ে ভয় পাইয়ে দিতাম। ও চিৎকার করত পাগলের মতো। ও ভাবত, নেকড়েটা ছুটে এসে ওকে খেয়ে ফেলবে। এখন বুঝতে পারি...মিসেস সেন, আপনি শুনছেন তো ?'

'হ্যাঁ, শুনছি—' মিলির কথা আটকে যাচ্ছিল। ও ছোট্ট করে কেশে গলা পরিষ্কার করল।

'এখন বুঝতে পারি, মিসেস সেন, ওরকম মজা করাটা আমাদের উচিত হয়নি। যাই হোক, আমার মনে হয়, ওই ছবির নেকড়ের কাল্পনিক ভয়ের সঙ্গে লড়াই করার জন্যেই চাঁদু নিজেকে নেকড়ে বলে ভাবতে চেষ্টা করে। ধীরে ধীরে সেই ধারণা জমাট বেঁধেছে। তারপর একসময় ও লাইক্যান্‌থ্রোপ হয়ে গেছে। আমরা ওর অসুখ সারানোর চেষ্টা করেছি। তবে সে-সবই টোটকা—তেমন কোনও কাজ হয়নি। আর চাঁদু তো স্রেফ নাম পালটে নিয়েই ভেবেছে এতেই ওর অসুখ সেরে যাবে।' লোকটা অনেকক্ষণ পরে হাসল, বলল, 'তবে আপনার সুনীতবাবুর—মানে চাঁদুর—একটা ব্যাপার বেশ ভালো। ওর এই অসুখটা সবসময় দেখা যায় না। কয়েক মাস হয়তো অসুখে ভুগল, তারপর বেশ কয়েক বছর হয়তো কিছুই হল না। সেইজন্যেই আপনি এতদিন কিছু টের পাননি। আমার মনে হয়, গত মাসে তোপচাঁচির ব্যাপারটা দিয়েই বোধহয় অসুখটা আবার নতুন করে শুরু হয়েছে—'

মিলি শুনছিল আর নিজেকে শক্ত করছিল। দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল শক্ত করে ও তাকিয়ে ছিল জঙ্গলের ছবিটার দিকে। এই জঙ্গলের মধ্যে একটা নেকড়ে আছে—মানুষ-নেকড়ে। মিলির চোখের সামনে ছবির সূর্যটা যেন পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে গেল, আর একটা অদ্ভুত হিংস্র প্রাণী জঙ্গলের গাছের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল বাইরে।

'এই...এই অসুখটার সময়ে ঠিক কী হয় ? প্লিজ, খুলে বলুন আমাকে—'

'বলছি, বলছি। উতলা হবেন না, মিসেস সেন।' লোকটা খসখসে গলায় আশ্বাস দিল বটে, কিন্তু তার সুরে কোনও প্রাণ ছিল না। অন্তত মিলির তাই মনে হল।

'সুনীতের এই অসুখটা নিয়ে আমি অনেক খোঁজখবর করেছি। ১৯৩০ সালে "সাইকিক সেল্‌ফ ডিফেন্স" নামে একটা বই বেরিয়েছিল। ডিওন ফরচুন ছদ্মনামে বইটা লিখেছিলেন ভায়োলেট ফার্থ। এই বইয়ে মানুষ-নেকড়ের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মিস ফার্থ বলেছেন, যাদের মন খুব শক্তিশালী হয় তারা ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে কোনও প্রাণী সৃষ্টি করতে পারে। অর্থাৎ, তাদের চিন্তার ছায়ার প্রাণ থাকে। মিস ফার্থ নিজেই একবার এরকম করেছিলেন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে এক বন্ধুর কথা ভাবছিলেন। সেই বন্ধু তাঁর খুব ক্ষতি করেছিল। তার শোধ নিতে নানা কথা ভাবছিলেন। তখনই, আধো আধো ঘুমের ঘোরে, হঠাৎই তাঁর মনে পড়ে যায় স্ক্যান্ডিনেভিয়ার মানুষ-নেকড়ে কিংবদন্তীর কথা। তারপরই মনের সব বাঁধন ছিঁড়ে কেমন বেপরোয়া উদ্দাম হয়ে ওঠেন মিস ফার্থ। মনে হয়, পেটের ভেতরটা টেনে ধরছে কেউ। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পান, বিছানায়, তাঁর ঠিক পাশেই গা ঘেঁষে বসে রয়েছে একটা বিশাল নেকড়ে। ভয় পেলেও মিস ফার্থ মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিলেন। তিনি হুকুম করতেই নেকড়েটা বিছানা থেকে নেমে যায়। তখন মনে হল সেটা যেন একটা কুকুর হয়ে গেল। তারপর ঘরের এক কোণ দিয়ে সেটা চলে গেল বাইরে।

'এই ব্যাখ্যাটা আমার খুব একটা মনে ধরেনি, মিসেস সেন। শুধু চিন্তা করে কোনও

প্রাণী তৈরি করাটা কেমন আজগুবি মনে হয়। তাছাড়া শুধু প্রতিশোধ নেওয়াই কি মানুষ-নেকড়ের উদ্দেশ্য? তোপচাঁচির ওই মেয়েটা সুনীতের কী ক্ষতি করেছিল? বাদুর বাগানবাড়ির ওই কুকুরটাও তো ওর কোনও ক্ষতি করেনি! আসলে তখন ওর মনের ভেতরে একটা ভয়ঙ্কর রাগ কাজ করতে থাকে। হাতের কাছে যা পায়, যাকে পায়, তাই দাঁত-নখে চিরে ফালাফালা করতে থাকে। নিজের মনটা একটুও বশে থাকে না।'

'তখন—তখন কি শরীরটা—শরীরটা বদলে যায়?' মিলি অবাক হয়ে লক্ষ করল, ওর গলার স্বর এখন অনেক শান্ত, তার মধ্যে এতটুকু কাঁপুনি নেই।

'কারও কারও ধারণা, শরীরটা সত্যিই বদলে যায়।' লোকটার খসখসে স্বর যেন কোনও ষড়যন্ত্রীর। খুব ধীরে ধীরে কথা বলে সে। সাপুড়ের বাঁশির সুর মনে পড়ে যায় মিলির। সে বলতে থাকে: 'গায়ের চামড়া পুরু খসখসে হয়ে যায়। লোমগুলো পশুর মতো বেড়ে যায়। আঙুলের নখও হয়ে যায় শ্বাপদের মতো। মুখের ভেতরে দাঁতের চেহারাও বদলাতে থাকে। কুকুরে-দাঁত দুটো আরও লম্বা হয়ে যায়, আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তখন একটা পাগল-করা রাগ এই অদ্ভুত জানোয়ারটাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। তারপর—'

'তারপর—?' সম্মোহিতের মতো প্রতিধ্বনি তোলে মিলি। পরশু রাতে দেখা সুনীতের রাগী মুখটা মনে পড়ছিল ওর।

'তারপর ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টাদুয়েক পর অসুখের ঘোর কেটে গেলে নেকড়ে-মানুষটা আবার স্বাভাবিক মানুষ হয়ে যায়। অসুখের সময়কার প্রায় সব ঘটনাই সে ভুলে যায়। সাধারণত একমাস কি দু'-মাস অন্তর এরকম হয়। এর চেয়ে ঘন ঘন হয় বলে কখনও শুনিনি। আবার, একটু আগেই যা বললাম, কারও কারও বেলায় অসুখটা হঠাৎ হঠাৎ সেরে যায়। মানে, সেরে যায় বলে মনে হয়, আসলে ঘাপটি মেরে থাকে।'

লোকটা এবার সুর পালটে ফেলে। মিলিকে আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে, 'মিসেস সেন, প্লিজ, ঘাবড়ে যাবেন না। আসলে অসুখটার ব্যাপারে যত জেনে রাখবেন ততই আপনার সুবিধে। আমি ওকে সারিয়ে তোলার কম চেষ্টা করিনি। এই অসুখ নিয়ে যতটা সম্ভব খোঁজখবর করেছি। তবে ভেবেছিলাম, ওর অসুখটা বুঝি সেরে গেছে। কিন্তু সেদিন ওর মুখের চামড়া, হাতের লোম, দাঁত আর নখ দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল। তারপর যখনই ও বলল ও ধানবাদে ট্যুরে গিয়েছিল—গত মাসে, পূর্ণিমার সময়ে—তখনই আমি চমকে উঠেছি। কারণ ওই মেয়েটির খুনের খবর আমি পড়েছিলাম। সে-সময়ে বাগানবাড়ির সেই কুকুরটার কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল। মনে পড়েছিল চাঁদুর কথা।

'সুতরাং নতুন করে দেখা হওয়ার পর ওর কথা শুনে, ওর চেহারা দেখে আমার সন্দেহ হয়। সে-রাতটা কিছুতেই আমি ঘুমোতে পারিনি। পরদিন বিকেলে আর থাকতে না পেরে ওকে ফোন করেছি। ফোন করে সাবধান করে দিতে চেয়েছি। তখনই জানলাম, চাঁদু বিয়ে করেছে। আপনি ওর স্ত্রী।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল লোকটা। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

টেলিফোনের রিসিভারটা মিলি এত জোরে কানে চেপে রেখেছে যে, ওর কান ব্যথা করছিল। রিসিভারটা হাতবদল করে এবার ডান হাতে ধরল। বলল, 'বলুন, শুনছি—'

'এখন ওর অসুখের ব্যাপারটা আপনাকেই সামলাতে হবে। ওর লাইক্যানথ্রপি অসুখটা যে ঠিক কী ধরনের তা জানি না। ডিওন ফরচুনের মতো বোধহয় নয়। আর অসুখের

সময়ে ওর চেহারা পালটে ভয়ঙ্কর হয়ে যায় কিনা তাও আমার জানা নেই।' একটু থেমে শ্বাস টেনে টেনে বলল, 'জানতে চাইও না। এছাড়া আর একরকমের লাইক্যানথ্রপি হয়। এতে শরীরে কোনও পরিবর্তন হয় না। পালটে যায় মনটা। মানুষটা ভাবে যে, সে একটা নেকড়ে হয়ে গেছে। প্রাচীন মিশরে পুরোহিত বা ওঝারা এইরকম মানুষ-নেকড়ে হয়ে অপরাধীকে সাজা দিত বলে শোনা গেছে।

'সব দেখেশুনে আমার মনে হয়েছে, চাঁদুর অসুখটা স্রেফ মনের অসুখ হলেই ভালো। আমার ধারণা, আজ রাতেই আপনি সব টের পাবেন। আজকের রাতটা নিরাপদে কেটে গেলে আর কোনও ভয় নেই...'

লোকটা হঠাৎই কাশল। গলার স্বর জোরালো করে বলল, 'আচ্ছা মিসেস সেন, এখন রেখে দিচ্ছি। কাল ফোন করে খবর নেব। তখন ঠিক করা যাবে, এই অসুখের ব্যাপারটা চাঁদুর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করা যায় কিনা। আপনাকে যত ডিটেলসে বললাম ওকে কখনও এভাবে বলিনি। আচ্ছা, রাখছি—'

লাইন কেটে দিল লোকটা।

দেওয়ালঘড়িতে সুর করে চারটে ঘন্টা বাজল। সুনীত ফিরবে হয়তো ছ'টা নাগাদ। এই দু'-ঘন্টার মধ্যে মিলিকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আজ রাতে যদি কোনও বিপদ হয় তাহলে আত্মরক্ষার জন্য কিছু একটা অন্তত ব্যবস্থা রাখা দরকার। কিন্তু কী ব্যবস্থা?

এ-ঘরে ও-ঘরে পাগলের মতো পায়চারি করতে শুরু করল মিলি। তারপর মনটাকে শক্ত করে রান্নাঘরে ঢুকল। বাসনপত্র রাখার আধুনিক ক্যাবিনেট খুলে একটা বড় ছুরি বের করে নিল। বেশি ব্যবহার করা হয়নি ছুরিটা। রান্নাঘরের জানলা দিয়ে এসে পড়া আলোয় ঝকঝক করছে। বাঁ হাতের তর্জনী ছুরির ফলায় ঠেকাল মিলি। সঙ্গে সঙ্গে চাপা চিৎকার করে উঠল : 'উঃ!' ওর তর্জনীর ডগা চিরে গেছে, রক্ত বেরোচ্ছে।

আঙুলটা মুখে পুরে চুষতে চুষতে শোবার ঘরে এল মিলি। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় ওর ছায়া পড়েছে। এ কী চেহারা হয়েছে ওর! চোখ বসে গেছে, চোখের কোলে কালি, কপালে সূক্ষ্ম ভাঁজ। তার ওপরে ডান হাতে ধরা বিশাল ছুরিটা ওকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে।

আয়নার কাছ থেকে সরে এসে ছুরিটা বিছানার গদির নীচে লুকিয়ে রাখল মিলি।

না, তোপচাঁচির ওই মেয়েটার মতো অসহায়ভাবে প্রাণ দেবে না ও। কিংবা বাদুর ওই কুকুরটার মতো। আজ ওকে লড়াই করতে হবে একটা...একটা অসুখের সঙ্গে। একটা অমানুষের সঙ্গে।

অতএব মিলি সুনীতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

অপেক্ষা করতে লাগল পূর্ণিমার রাতের জন্য।

দেওয়ালে টাঙানো জঙ্গলের ছবিটা ওর চোখ টানছিল বারবার।

সুনীত বাড়ি ফিরল বেশ খোশমেজাজেই।

তারপর রোজকার মতো জামাকাপড় ছেড়ে স্নান সেরে ফিরে এল। মিলি রুমিকে নিয়ে ওদের চা-জলখাবারের জোগাড় করছিল। সুনীত চেঁচিয়ে বলল, 'হানি, আজ বড্ড খিদে পেয়ে গেছে। চটজলদি কিছু ব্যবস্থা করো—'

মিলি সাড়া দিল রান্নাঘর থেকেই। তারপর একটু পরেই ট্রে হাতে ঢুকে পড়ল ড্রইং

স্পেসে। টেবিলে ট্রে নামিয়ে রেখে বলল, 'নাও—'

সুনীত সোফায় বসে বাংলা খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছিল। ট্রে-র দিকে তাকিয়ে লোভীর গলায় বলল, 'বাব্বাঃ, কী দারুণ ব্যাপার! পেঁয়াজ কাঁচালঙ্কা দিয়ে আলুর বড়া, চিঁড়েভাজা, তার সঙ্গে কফি! ওঃ, জিভে জল এসে যাচ্ছে, মাইরি—'

মিলি শাড়ির আঁচলটা ঠিকঠাক করে নিয়ে পাশের সোফাটায় বসে পড়ল। বলল, 'তোমার ব্যবসার ভাষা ব্যবসাতেই রেখে এসো, বাড়ি পর্যন্ত দয়া করে বয়ে নিয়ে এসো না—'

খবরের কাগজ রেখে সুনীত আলুর বড়ায় কামড় দিয়ে চোখ কপালে তুলল, 'কোন ব্যবসার ভাষা?'

মিলি সুর টেনে চোখ মটকে বলল, 'আহা, বোঝেনি যেন! ওই লাস্টের শব্দটা—'

'মানে, মাইরি! তুমি জানো, এটা কী দারুণ সুইট শব্দ! বেমিসাল, লাজবাব... বইয়ে এরকম আরও কত প্রশংসা আছে এই শব্দটার?'

মিলি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে বলল, 'তাই? সত্যি? কোন বইতে আছে?'

'ইয়েস—' একমুঠো চিঁড়েভাজা মুখে চালান করে চিবোতে চিবোতে জড়ানো গলায় সুনীত বলল, 'এটা তুমি পাবে সুনীতকুমার সেনের লেখা "দ্য ওরিজিন অ্যান্ড ডেভোলাপমেন্ট অফ দ্য বেঙ্গলি স্ল্যাঙ" বইতে। বইটা বাংলার এম. এ. ক্লাসে পাঠ্য হয়েছে এ-বছরে।'

চাপা গলায় 'ছোটলোক' বলে উঠে পড়ল মিলি। রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতেই বলল, 'একটু নুন নিয়ে আসি। রুমির খাবারটা দেওয়া হয়নি—ভুলে গেছি।'

সুনীত খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে মনোযোগ দিল আবার। একই সঙ্গে ওর মুখও চলতে লাগল, চোয়াল নড়তে লাগল।

মিলি নুনের ছোট্ট কৌটোটা হাতে করে ফিরে এল। টিভি অন করে আবার এসে বসে পড়ল সোফায়। সুনীতকে দেখতে দেখতে বলল, 'কী ব্যাপার! তোমার আজ এত ফুর্তি!'

সুনীত কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'সত্যিই, মেজাজটা বেশ হালকা লাগছে। জানো, গৌতমের প্রব্লেম সল্‌ভ করে দিয়েছি?'

মিলি খুশি হল। বলল, 'ভালো করেছ। পরশুদিন শুনেই আমার কেমন খারাপ লাগছিল—'

'ওর বাড়িতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি বাড়ি নেই। তখন একটা কনফিডেনশিয়াল চিঠি রেখে এসেছি। বাড়িতে ফিরে চিঠিটা পেয়ে ও তাজ্জব হয়ে যাবে।'

মিলি স্বাভাবিক কৌতূহল থেকেই জানতে চাইল, 'সেদিন আপত্তি করলে, আর আজ হঠাৎ রাজি হয়ে গেলে?'

সুনীত কফি শেষ করে সিগারেট ধরাল। তারপর মিলির দিকে সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে ধরে চোখের ইশারা করল: 'চলবে নাকি?'

মিলি কটমট করে তাকাল।

তাড়াতাড়ি সিগারেটের প্যাকেটটা সরিয়ে নিয়ে সুনীত বলল, 'না, আসলে হঠাৎ করে টেলিভিউ টিভি কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তখন গৌতমের কথা মনে পড়ে গেল। ও আমার ব্যক্যার জন্যে অনেক করেছে। তাই ফস করে রিকোয়েস্ট করে বসলাম আর এম. ডি. রাজি হয়ে গেল।'

মিলির ভালো লাগছিল। অথচ সেদিন সুনীতকে কী নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল। ওর মুখে ফুটে উঠেছিল নতুন কয়েকটা অচেনা পেশি।

টিভিতে একটি সুন্দরী মেয়ে মিষ্টি গলায় কী সব বলছিল। সেদিকে দেখতে দেখতে সুনীত বলল, 'তুমি টিভিতে একটা চাকরি নিতে পারতে। গৌতমের মাসতুতো বোন অ্যাপ্লাই করেছিল, পেয়ে গেছে—'

চিড়েভাজা খেতে খেতে মিলি বলল, 'হুঁঃ, আমার এই চেহারায়...'

সুনীত মিলিকে এই প্রথম যেন খুঁটিয়ে দেখল। পুরোপুরি খুশি হল না। গলা পালটে জিগ্যেস করল, 'অ্যাই, কী হয়েছে বলো তো?'

মিলি বাঁ হাতটা মুখে বুলিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'উহুঁ, কিছু না তো—'

'আচ্ছা, তোমার ওই লাইক্যান্থ্রপির মানে জানতে পারলে?'

মিলি চমকে উঠল ভীষণভাবে। আর একটু হলেই কফির কাপ পড়ে যেত হাত থেকে। সুনীতের হাত আর বুকের লোম দেখতে দেখতে ও বলল, 'না, জানতে পারিনি—আমাদের ডিকশনারিটায় নেই।'

সুনীত হাসল, বলল, 'শব্দটা শুনলেই কেমন হাসি পায়—'

মিলির মনে হল, সুরেলা মূর্ছনার মাঝে বেসুরো টান পড়েছে তারে। অথচ সুনীত সেরকমভাবে কিছু বলেনি, কিছু করেনি।

সুনীত ব্রিফকেসটা চাইল মিলির কাছে। সিগারেটটা টেবিলের অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিতে দিতে বলল, 'অফিসের সামান্য কয়েকটা কাজ আছে। দেখি, চট করে সেরে নিতে পারি কি না—'

মিলি ব্রিফকেসটা এগিয়ে দিল ওকে। রুমিকে ডেকে বলল, জলখাবারের কাপ-প্লেট সব নিয়ে যেতে। তারপর টিভিটা অফ করে লো ভলিয়ুমে টেপ-ডেক চালিয়ে দিয়ে চলে গেল বারান্দায়।

কাল থেকেই বৃষ্টি আর নেই। শুধু মেঘের আনাগোনা। বাতাস বইছে নরম গতিতে। মিলি গ্রিলের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে দাঁড়াল। যেন অদৃশ্য চুম্বকের টানে ওর নজর চলে গেল চাঁদের দিকে। গাঢ় নীল ভেলভেট রাতের কপালে সোনালী টিপ। চাঁদ, আহা পূর্ণিমার চাঁদ। ওকে দেখছে।

অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে চাঁদ দেখতে দেখতে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছিল মিলি। স্মৃতিপথের নানা অলিগলি ওকে টানছিল।

এইভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে কে জানে। হঠাৎই কাঁধের ওপরে একটা হাত রাখল কেউ।

চমকে উঠল মিলি। অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল ঠোঁট চিরে। এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়াল।

সুনীত।

কিন্তু এ কোন সুনীত? একটু আগের দেখা সুনীত তো নয়। ওর ছায়াময় মুখে আবার দেখা দিয়েছে সেই অচেনা পেশিগুলো। মনের গহনে কোন সেফ ডিপোজিট ভল্টে মুখের হাসিখুশি ভাব জমা পড়ে গেছে।

সুনীত ওকে কাছে টানল। বলল, 'ওই দ্যাখো—' আঙুল তুলে দেখাল চাঁদের দিকে।

মিলির শরীরটা সামান্য শক্ত হল। সুনীতের হাতে কী জোর। ওর ছোঁয়াও কেমন যেন রুক্ষ পাশবিক মনে হচ্ছে।

সুনীত বলল, 'এই চাঁদ দেখেই কেউ মধুচন্দ্রিমা শব্দটা আবিষ্কার করেছিল।'

মিলি বলল, 'হুঁ—' তারপর নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইল।

সুনীত আরও কাছে টেনে নিল ওকে। বলল, 'ভয় পাচ্ছ কেন? রুমি রান্নাঘরে, রুটি বেলছে। আমি দেখে এসেছি।'

মিলি নিচু গলায় বলল, 'না, রুমির জন্যে না।' ওর বুকের ভেতরে হাতুড়ির শব্দ শুরু হয়ে গেল। প্রথমে আস্তে, তারপর জোরে।

সুনীত মিলিকে জড়িয়ে ধরে চুলের ঘ্রাণ নিল। আঙুলের আলতো ছোঁয়ায় আদর করল গালে।

টেলিফোনের কথা মনে পড়ল মিলির: 'ও যদি পূর্ণিমার চাঁদ না দ্যাখে তাহলে ভালো হয়...' কিন্তু আর কিছু করার নেই। মিলি তো আর মেঘ হয়ে পূর্ণিমার চাঁদকে আড়াল করতে পারে না!

ঘড়িতে মিষ্টি সুরে ঘণ্টা বাজতে শুরু করল। ক'টা ঘণ্টা বাজল? আটটা, না ন'টা? মনে মনে হিসেব করতে চাইল মিলি, পারল না।

সুনীতের হাত এখন বেপরোয়া হয়ে ওর শরীরের যে-কোনও বিপজ্জনক বাঁকের দিকে এগিয়ে চলেছে। কাঁধের ওপরে ওর নিশ্বাসের তাপ অনুভব করতে পারছিল মিলি। চাঁদের আলোয় সুনীতের হাতের লোমের দিকে ও তাকিয়ে ছিল। লোমগুলো কি মাপে আরও বড় আর ঘন হয়ে উঠছে? নাকি চাঁদের মায়াবী আলোয় চোখের বিভ্রম?

হঠাৎই ভীষণ ভয় পেল মিলি। ওর শরীর কেঁপে উঠল থরথর করে। সুনীতের মুখটা ও দেখতে চেষ্টা করল। কোনও পরিবর্তন কি শুরু হয়েছে সেখানে?

মিলি ধীরে ধীরে শোবার ঘরের দিকে এগোতে চেষ্টা করল। যদি একবার ও বিছানার কাছাকাছি যেতে পারে তাহলে আত্মরক্ষার অস্ত্রটা ওর নাগালে চলে আসবে। তারপর...।

আশ্চর্যভাবেই মিলির নতুন চেষ্টায় কোনও বাধা দিল না সুনীত। ওর মনটাও বোধহয় অন্ধকার শোবার ঘরে বিছানার ছোঁয়া চাইছিল। চাঁদের আলো মাড়িয়ে এলোমেলো দু-জোড়া পা কোনওরকমে চলে এল শোবার ঘরে। আর তখনই মিলির মনে হল, সুনীতের ছোঁয়া আরও কর্কশ, আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। ও সুনীতের মুখ দেখতে চেষ্টা করল। মাথা পিছনদিকে সামান্য হেলিয়ে ও তাকাল সুনীতের আবছায়া মুখের দিকে।

গ্রিলের ফাঁকে পূর্ণিমার চাঁদ। তার আলো বিছানায়, বালিশে, সুনীতের মুখেও। ওর ঠোঁটের ওপরটা কী অস্বাভাবিক ফুলে উঠেছে! বেড়ে ওঠা কুকুরে-দাঁত কি মুখের ভেতরে আর জায়গা পাচ্ছে না, তাই ঠোঁট চিরে বেরিয়ে আসতে চাইছে?

মিলির কান্না পেয়ে যাচ্ছিল। ঠিক তখনই সুনীত ওকে ঠেলে দিল। ওরা বসে পড়ল বিছানায়। মিলির গালে, ঠোঁটে, কপালে পাগলের মতো চুমু এঁকে দিচ্ছিল সুনীত।

মিলি একবার ভাবল রুমির নাম ধরে ডেকে উঠবে কি না। কিন্তু তাতেও যদি সুনীত না থামে? তাছাড়া কেউ কি বিশ্বাস করবে মিলির কথা, ওই অদ্ভুত অসুখের কথা? ওদের শৌখিন ফ্ল্যাটের শোবার ঘরটা পলকে তোপচাঁচির জঙ্গল হয়ে গেল। একই সঙ্গে বাবা, মা, দাদার কথা মনে পড়ল মিলির। ওর বুকের ভেতরটা কেমন মুচড়ে উঠল।

শোবার ঘরের দরজা যে বন্ধ নেই সেটা এইমাত্র খেয়াল হল সুনীতের। মুখে ছোট্ট একটা শব্দ করে ও দরজা বন্ধ করতে গেল। আর তখনই মিলি বিছানার গদির নীচে হাতড়াতে শুরু করল। কোথায় গেল ছুরিটা?

সুনীত দরজার কাছে পৌঁছতেই টেলিফোন বাজতে শুরু করল।

মিলি হাঁফধরা গলায় কোনওরকমে বলে উঠল, 'ফোন—'

সুনীত দরজায় ছিটকিনি দিতে দিতে বলল, 'বাদ দাও। বাজুক—'

'না!' মিলি এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। শাড়ির আঁচলটা ঠিকঠাক করতে করতে বলল, 'আমার একটা জরুরি ফোন আসার কথা ছিল—বাড়ি থেকে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে টেলিফোনের শব্দটা থেমে গেল। অন্ধকারেই হাসল সুনীত। অস্পষ্টভাবে ওর দাঁত দেখা গেল। বলল, 'যাক, বাঁচা গেছে—'

সুনীত যখন আবার মিলির খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, ওকে আবার জাপটে ধরেছে, তখনই দরজায় ধাক্কা শোনা গেল। একই সঙ্গে রুমি ডেকে উঠল, 'বউদি! বউদি! তোমার ফোন—'

সুনীত একটু থমকে গিয়েছিল। ও ভাবেনি রুমি রান্নাঘর থেকে এসে ফোন ধরবে। মিলি আচমকা ওর হাত ছাড়িয়ে প্রায় ছুটে গেল দরজার দিকে। চেঁচিয়ে বলল, 'দাঁড়া, ধরছি—' আর পরক্ষণেই দরজা খুলে একছুটে সোজা টেলিফোনের কাছে।

'হ্যালো—'

'বউদি, অজস্র ধন্যবাদ আপনাকে, মেনি মেনি থ্যাঙ্কস। আপনার কাছে আমি গ্রেটফুল।'

গৌতম! স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলল মিলি। কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে বড় বড় শ্বাস ফেলে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করল। তারপর বলল, 'কেন, গ্রেটফুল কেন, গৌতমদা?'

'এইমাত্র বাড়ি ফিরে সুনীতের লেখা একটা চিঠি পেয়েছি। আমার কাজটা ও করে দিয়েছে। তবে লিখেছে, আর কখনও যেন এরকম রিকোয়েস্ট না করি। সত্যি বউদি, আমি একটা সাঙ্ঘাতিক বিপদ থেকে বেঁচে গেলাম। জানি, আপনি ওকে বলেছেন বলেই কাজটা করেছে। নইলে যেভাবে আমাকে বারবার রিফিউজ করছিল—'

মিলি আলতো গলায় বলল, 'আমি কিছু বলিনি। যা করার ও নিজেই করেছে। মাঝে মাঝে যেরকম গোঁ ধরে বসে থাকে—'

'জানি। সেইজন্যেই তো ওকে শায়েস্তা করার ব্যবস্থা করেছিলাম। বারবার রিফিউজড হয়ে আমার এমন রাগ হয়ে গিয়েছিল, ওকে বলেছি, আমাকে সর্বনাশের মধ্যে ডুবিয়ে তুই ফুর্তিতে থাকবি, সেটা হচ্ছে না। তারপর মাথায় যা এসেছে, যা খুশি—আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন, বউদি। শুধু শুধু এ-ক'টা দিন আপনাকে টেনশানে ভুগিয়েছি...'

সেই মুহূর্তে মিলির মাথার মধ্যে সব কীরকম গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। ও মুখ ফিরিয়ে একবার দেখল শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা সুনীতকে। তারপর টেলিফোনে বলল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, গৌতমদা—'

'বুঝতে পারছেন না? ওই যে, চন্দ্রকান্ত সেন, চাঁদু, লাইক্যান্থ্রপি, তোপচাঁচির খুন—এ-সবই তো আমার বানানো গপ্পো। তবে হ্যাঁ, তার জন্যে নেকড়ে-মানুষ নিয়ে একটু বইপত্র ঘাঁটতে হয়েছে। আপনাকে এ ক'দিন কীরকম ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম বলুন তো? ধরতে পেরেছিলেন যে পুরোটাই গাঁজাখুরি?'

গৌতম অট্টহাসি হেসে উঠল টেলিফোনের ওপারে। হাসতেই লাগল। অনেকক্ষণ ধরে হাসল। তারপর গলার স্বর পালটে খসখসে গলায় বলল, 'আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি, মিসেস সেন। চাঁদুকেও বলবেন আমাকে যেন ভুল না বোঝে। এটা স্রেফ একটা খেলা ছিল, মজার খেলা—'

মিলির চোখে জল এসে গেল পলকে। এর নাম খেলা! গৌতম কি বুঝতে পারছে, সেই প্রথম টেলিফোন পাওয়ার পর থেকে মিলির দিনরাতের প্রতিটি মুহূর্ত কী অবস্থায় কেটেছে, কীভাবে বেঁচে থেকেছে ও ?

টেলিফোন রেখে সুনীতের দিকে ঘুরে তাকাল মিলি। ওই তো, সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর প্রিয়তম পুরুষ। অথচ অজ্ঞাতকুলশীল টেলিফোন পেয়েই মিলি ধীরে ধীরে হেরে যাচ্ছিল সন্দেহের ঘুণপোকার কাছে!

সুনীতের কাছে ছুটে এল মিলি। কাঁদতে কাঁদতেই জাপটে ধরল ওকে। ঠেলে দিল শোবার ঘরের ভেতরে।

সুনীত অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার ? কার ফোন ? কাঁদছ কেন, মিলি ?'

সুনীতের একটা প্রশ্নেরও উত্তর দিল না মিলি। দরজায় ছিটকিনি তুলে দিয়ে ওকে জাপটে ধরে পেড়ে ফেলল বিছানার ওপরে। পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল সুনীতের মুখে, চোখে, নাকে, গলায়, বুকে। সুনীতও ওর ডাকে সাড়া দিল। ওর লোমশ হাত আর বুকের স্পর্শে মিলির গায়ে কাঁটা দিল। ভালোবেসে আজ ওকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলুক সুনীত। এই ফ্ল্যাটটা হয়ে যাক তোপচাঁচির জঙ্গল। আর আকাশ থেকে নির্লজ্জ চাঁদ যত খুশি দেখুক ওদের। চাঁদ যদি দ্যাখে তাহলে ভালোবাসা আরও বেড়ে যাবে।

ভালোবাসাবাসির মধ্যেই বিছানার গদির নীচে রাখা ছুরিটার কথা মনে পড়ল মিলির। অন্ধকারেই চোখ বুজে ঠোঁটে হাসল ও। ওর প্রিয়তম পশুর কাছ থেকে আর কখনও আত্মরক্ষার দরকার হবে না। কখ্খনও না।

মিলি তখন আনন্দে মরে যাচ্ছিল।

ক্ষুরধার খেলা : দুই

অনন্তনারায়ণ বসুরায়ের বরাবরের নেশা মানুষ-নেকড়ের। জন্মের সময় মাকে হারিয়েছিলেন বলে অনন্তনারায়ণের ছোটবেলাটা কেটেছিল বাবার সঙ্গেই, জঙ্গলে জঙ্গলে। অনন্তনারায়ণের বাবা জিতেন্দ্রনারায়ণ চাকরি করতেন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে। আর একই সঙ্গে অসম্ভব এক নেশা ছিল তাঁর—শিকারের নেশা। এই মারাত্মক নেশার টানে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন তিনি। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে শিকার করতেন। তাঁর সঙ্গে অনন্তনারায়ণও গেছেন দু'-একবার। বাঘ, সিংহ, হরিণ, সাপ—এরকম কত প্রাণী শিকার করতেন জিতেন্দ্রনারায়ণ। সরকারি বিধিনিষেধ মানতেন না। ভীষণ বেপরোয়া ছিলেন। কিন্তু মধ্যপ্রদেশের কান্‌হা ফরেস্টে একবার একটা নেকড়ে শিকার করার পর থেকেই তাঁর মধ্যে কেমন একটা পরিবর্তন আসে। নেকড়ের বিষয়ে দিনরাত পড়াশোনা করতে শুরু করেন। আপনমনে ডায়েরি লিখতেন পাতার পর পাতা। কিশোর অনন্তনারায়ণ কৌতূহলে উঁকি মারতেন সেই ডায়েরির পাতায়। সেই সময়েই তাঁর চোখে পড়ে একটি লাইন : '... আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কান্‌হার জঙ্গলে মানুষ-নেকড়ের অস্তিত্ব রয়েছে।' হয়তো তখন থেকেই এই অদ্ভুত নেশার বীজ ঢুকে পড়েছিল অনন্তনারায়ণের কিশোর মনে।

পরে, বড় হয়ে, অনন্তনারায়ণ মনোবিজ্ঞানী হয়েছেন। ফলে তাঁর ছোটবেলার নেশা খানিকটা মোড় নিয়েছে বিজ্ঞানের পথে। কিন্তু তাই বলে মানুষ-নেকড়ের কুসংস্কারের সবটুকু যে তিনি শরীর ও মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পেরেছিলেন, তা নয়।

মানুষ-নেকড়ে বড় অদ্ভুত প্রাণী। কেন এই অদ্ভুত সংকর-প্রাণীর অস্তিত্ব রয়েছে, সেটা খুঁজে পাওয়াটাই এখন অনন্তনারায়ণের ধ্যানজ্ঞান। তিনি শুধু ভাবেন, কোন অলৌকিক নিয়মে এরকম বিচিত্র সেতু-বন্ধন ঘটে গেছে দুটি বিভিন্ন প্রাণীর! মানুষ ও নেকড়ের সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছে মানুষ-নেকড়ে!

বনে-জঙ্গলে দীর্ঘকাল ঘুরে বেড়ানোর ফলে বহু গাছপালা চিনতেন জিতেন্দ্রনারায়ণ। জানতেন তাদের গুণাগুণের কথাও। ফলে একসময়ে শিকার ছেড়ে তিনি আয়ুর্বেদ চিকিৎসা নিয়ে পড়লেন। তাঁর নতুন পরিচয় তৈরি হল ডাক্তার হিসেবে। ডাক্তারির জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের উপজাতিদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়ে গেল। কুসংস্কারে বিশ্বাসী মানুষগুলোর সান্নিধ্যে এসে জিতেন্দ্রনারায়ণের কুসংস্কার জোরালো হচ্ছিল। মানুষ-নেকড়ের বিষয় নিয়ে তিনি প্রায়ই আলোচনা করতেন স্থানীয় মানুষগুলোর সঙ্গে। আর তারই মধ্যে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে লাগলেন অনন্তনারায়ণ। মানুষ-নেকড়ে যে

সত্যই আছে, এই বিশ্বাস দানা বাঁধল তাঁর মনে। তারপর বিশ্বাসের শিকড় হিলহিলে সাপের মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগল তাঁর শিরা থেকে উপশিরায়।

আসামের উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার জঙ্গলে মারা গিয়েছিলেন জিতেন্দ্রনারায়ণ। তখন তিনি মাকরিপুরে সেখানেই থাকতেন। একদিন কোন এক দুর্লভ লতার সন্ধানে বেরিয়েছিলেন, আর ফিরলেন না। তিন-তিনটে দিন কেটে গেল। কোনও খোঁজ নেই।

কিশোর অনন্তনারায়ণ দুশ্চিন্তায় প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। লোকজন নিয়ে বনে-জঙ্গলে বাবার খোঁজ করতে শুরু করলেন। আর রাতে উলটেপালটে দেখতে লাগলেন বাবার ডায়েরির পাতা। হঠাৎই তাঁর চোখে পড়েছিল একটি লাইন '...কাল জঙ্গলের উত্তর দিক থেকে আমি এক অস্বাভাবিক গর্জন শুনতে পেয়েছি। এ-গর্জন পশুর নয়। কিংবা মানুষেরও নয়। তবে কে করল এরকম ভয়ঙ্কর চিৎকার ?...'

লেখাটা পড়ে এক অদ্ভুত ভয় অনন্তনারায়ণকে জড়িয়ে ধরেছিল।

চতুর্থ দিনে জিতেন্দ্রনারায়ণের খোঁজ পাওয়া গেল। জঙ্গলের গভীরে তাঁর ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ পাওয়া গেল। সারা শরীরে গভীর হিংস্র নখের দাগ। উন্মত্ত ক্রোধে কেউ ক্ষতবিক্ষত করেছে ডাক্তারবাবুর দেহ। চাপা গুঞ্জন উঠল, 'মানুষ-নেকড়ে! মানুষ-নেকড়ে!' অনন্তনারায়ণ পাথর হয়ে গেলেন। পিতার ক্ষতবিক্ষত দেহ তাঁর মনে স্থায়ী কতকগুলো ক্ষত তৈরি করল। শোকের চেয়ে কৌতূহলটাই বেশি করে জায়গা নিয়েছিল অনন্তনারায়ণের মনে। কিংবদন্তী কি কখনও সত্যি হয়!

এরপর কলকাতায় ফিরে এলেন অনন্তনারায়ণ। কাকার বাড়িতে মানুষ হতে লাগলেন। একা একা সময় কাটাতে ভালোবাসতেন তিনি। আর সেই নিঃসঙ্গ সময়ে তাঁর সঙ্গী ছিল জিতেন্দ্রনারায়ণের ডায়েরি। মানুষ-নেকড়ের ব্যাপারটা তাঁকে বড় ভাবিয়ে তুলত।

পড়াশোনায় মেধাবী ছিলেন অনন্তনারায়ণ। কাকা-কাকিমার নির্লিপ্ত অবহেলা তাঁর মনে সেরকম কোনও আঁচড় আটত না। ওঁদের আদেশমতো ফাইফরমাশ খাটতেন, আর বাকি সময়টা বইপত্র নিয়ে কাটাতেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করবেন। মানুষের মনের গূঢ় রহস্য তাঁকে জানতেই হবে।

একদিন কাজের সামান্য একটু ভুলের জন্য কাকিমা তাঁর মাথায় সাঁড়াশি দিয়ে বাড়ি মারেন। আঘাতটা তাঁর সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের জটিল কোনও ক্ষতি করেছিল। কিছুদিন চিকিৎসার পর অনন্তনারায়ণ মোটামুটি সুস্থ হয়ে ওঠেন। তারপর কাকার আশ্রয় ছেড়ে চলে যান।

এই ঘটনা অনন্তনারায়ণকে নারীবিদ্বেষী করে তুলেছিল।

পরিভাষায় যাকে জীবন-সংগ্রাম বলে, সেই সংগ্রামে উত্তীর্ণ হন অনন্তনারায়ণ। মনোবিজ্ঞানী হিসেবে গুণিজনের নজর কাড়েন তিনি। এমনিতে মানুষ নিয়ে গবেষণা করলেও, তাঁর প্রিয় বিষয় বরাবরের মতোই মানুষ-নেকড়ে। এই কাল্পনিক সংকর প্রাণীর নানা লক্ষণ তিনি খুঁজে বেড়াতেন সবার মধ্যে। ইওরোপের বলকান প্রদেশের কিংবদন্তী থেকে শুরু করে প্যারানরমাল ফেনোমেনার পণ্ডিতদের সাম্প্রতিকতম গবেষণাপত্র পর্যন্ত সবই অত্যন্ত আগ্রহে খুঁটিয়ে চর্চা করেছেন তিনি। বাবার অপঘাতে মৃত্যু তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেননি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভারতের নানা জায়গায়, বিশেষ করে পাহাড়ী অঞ্চলের জঙ্গলে মানুষ-নেকড়ের অস্তিত্ব রয়েছে।

সাইকিয়াট্রিস্ট অনন্তনারায়ণের পসার যখন বেশ জমে উঠেছে তখন এক যুবতীর প্রেমে

পড়লেন তিনি। কোনও নারীবিদ্বেষী পুরুষ যখন প্রেমে পড়ে তখন সে আর উঠতে পারে না—হাবুডুবু খায়। উত্তর-চল্লিশ অনন্তনারায়ণেরও সেই দশা হল।

মেয়েটির নাম সীতা মজুমদার। নিজের অস্থির মনের চিকিৎসা করাতে ও এসেছিল সাইকিয়াট্রিস্ট অনন্তনারায়ণ বসুরায়ের কাছে। ওর মধ্যে কিছু কিছু অদ্ভুত লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলেন অনন্তনারায়ণ। সীতা তাঁকে আগ্রহী করে তুলেছিল। কয়েকবার সিটিং-এর পরই তিনি বুঝতে পারেন, ফেরার আর কোনও পথ নেই।

সীতার রূপ, আবেগ ও আচরণ নেশার মতো পেয়ে বসল অনন্তনারায়ণকে। এ-নেশা নেকড়ে-মানুষের নেশার চেয়েও তীব্র। ভালোবাসার মহামারীতে কাবু হয়ে পড়লেন তিনি, এবং শেষ পর্যন্ত সীতাকে বিয়ে করলেন।

বিয়ের পর বেশ কিছুদিন সীতাকে নিয়ে মেতে থাকলেন অনন্তনারায়ণ। তাঁর অভ্যন্তরে এত তীব্র আবেগ লুকিয়ে ছিল তা কখনও তিনি বুঝতে পারেননি। এও বুঝতে পারেননি, সীতার মধ্যে অতিকামের লক্ষণ প্রচ্ছন্ন ছিল।

একটি বছর উদ্দাম ভালোবাসায় জীবন কাটিয়ে হঠাৎই এক পূর্ণিমার রাতে প্রথম ক্লান্তি বোধ করলেন অনন্তনারায়ণ। আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে পড়ে গেল জিতেন্দ্রনারায়ণের ডায়েরির কথা। বাবার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, মানুষ-নেকড়ের অস্তিত্ব রয়েছে।

সে-রাতে অনন্তনারায়ণ ভালো করে ঘুমোতে পারেননি। সারারাত ধরে নানা বিকৃত কল্পনা তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল।

এর দিনকয়েক পর খবরের কাগজের একটা খবর তাঁর নজর কাড়ল। বদ্রীনাথে তীর্থ করতে যাওয়ার পথে দু'জন তীর্থযাত্রী গোপেশ্বর থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। তার দু'দিন পর তাদের ছিন্নভিন্ন দেহ পাওয়া যায় চোপ্‌তার কাছে জঙ্গলে।

অনন্তনারায়ণ মনে মনে হিসেব কষে দেখলেন, নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাটা ঘটেছে পূর্ণিমার কাছাকাছি সময়ে। তাঁর মনে পড়ে গেল কান্‌হার জঙ্গলের কথা, বাবার মৃত্যুর কথা।

কয়েকটা দিন টানাপোড়েনের মধ্যে কাটিয়ে একদিন স্ত্রীকে বললেন, 'আমরা কিছুদিন বদ্রীনাথের কাছাকাছি একটা জায়গায় গিয়ে থাকব। কেদার-বদ্রী ঘোরা হবে, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স দেখা হবে, তাছাড়া পাহাড় তো আছেই।'

সীতা শুনে খুব খুশি হল। বলল, 'হানিমুন?'

'মুন' শব্দটা একলহমার জন্য অন্যমনস্ক করে দিল অনন্তনারায়ণকে। একটু সময় নিয়ে হেসে তিনি বললেন, 'একরকম তাই—।'

সুতরাং পনেরো দিনের মধ্যেই গোছগাছের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে হরিদ্বারের দিকে রওনা হলেন অনন্তনারায়ণ।

দীর্ঘ যাত্রাপথ শেষ করে ওঁরা এসে পৌঁছলেন গোপেশ্বরে।

গোপেশ্বর ছোট টাউন। বেশ কিছু দোকানপাট আছে। বাড়ি-ঘর-হোটেলও কম নেই।

এখানকার মানুষরা বোধহয় ফুল ভালোবাসে। কারণ ছোট-বড় প্রায় সব বাড়িরই ছাদে ফুলের টব। তাতে অর্কিড আর ক্যাকটাসের মেলা। জায়গাটা অনন্তনারায়ণের পছন্দ হল।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা মনের মতো বাড়ি পেলেন ওঁরা। একতলা ছোট বাড়ি,

সঙ্গে ফুলের বাগান। সামনে চোখ মেললেই পাহাড়ের ঢাল, ফুলগাছ, আকাশ, প্রকৃতি। গাড়োয়ালি মালিকের কাছ থেকে প্রাথমিকভাবে ছ'-মাসের জন্য বাড়িটা ভাড়া নিলেন অনন্তনারায়ণ।

ঘরে ঢুকে মালপত্র রেখেই সীতার থুতনি নেড়ে অনন্তনারায়ণ জিগ্যেস করলেন, 'কী, পছন্দ?'

সীতা বলল, 'হ্যাঁ, দারুণ—।'

অনন্তনারায়ণের মাথায় তখন গবেষণার ব্যাপারটা বারবার খোঁচা মারছিল।

এইভাবে শুরু হল তাঁদের শীতের দেশে দিনযাপন।

একদিন কথায় কথায় অনন্তনারায়ণ সীতাকে বলেই ফেললেন, 'ভাবছি নতুন করে গবেষণা শুরু করব—'

সীতা জানলার কাছে বসে ছিল। দূরের পাহাড় কুয়াশায় ঝাপসা। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। মাঠের সবুজ ঢালে ছায়ার মতো চরে বেড়াচ্ছে ভেড়ার পাল। সেদিকে তাকিয়ে আনমনাভাবেই ও প্রশ্ন ছুড়ে দিল, 'কিসের গবেষণা?'

'মানুষ-নেকড়ে নিয়ে,' উত্তর দিলেন অনন্তনারায়ণ।

সঙ্গে সঙ্গে সীতা চমকে মুখ ফেরাল। বলল, 'মানুষ-নেকড়ে? সেটা আবার কী?'

সীতার অবাক হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমত, স্বামীর গবেষণা নিয়ে কখনও ও মাথা ঘামায়নি, সে সুযোগও পায়নি। আর দ্বিতীয়ত, অনন্তনারায়ণ ওকে কখনও নিজের মানুষ-নেকড়ের নেশার কথা বলেননি।

সীতার বয়েস এবং লেখাপড়া, দুই-ই অল্প। সুতরাং ওর অবাক প্রশ্নে অনন্তনারায়ণ অবাক হলেন না। স্মিত হেসে শান্ত স্বরে বললেন, 'কাছে এসে বোস, বুঝিয়ে বলছি।'

সীতার চোখে-মুখে কৌতূহলের ছায়া পড়ল। জানলার কাছ থেকে উঠে এল ও। বাইরে সন্ধের অন্ধকার নেমে এসেছে। ঠাণ্ডা বাতাস আরও ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছে। যথেষ্ট শীতের পোশাকও সেই বাতাসের বিঁধুনি রুখতে পারছে না। গায়ের ভারী শাল আরও ভালো করে জড়িয়ে এল সীতা। চোখে বিস্ময়। কারণ এর আগে অনন্তনারায়ণের মুখে 'মানুষ-নেকড়ে' শব্দটা কখনও শোনেনি ও।

অনন্তনারায়ণ ফায়ার-প্লেসের কাছে একটা ভারী কাঠের চেয়ারে গা এলিয়ে ছিলেন। হাতে একটা বই খোলা অবস্থায় ধরা ছিল, সেটা নামিয়ে রাখলেন সামনের খাটো টেবিলে। পাশের একটা দড়ির কাজ-করা মোড়ার দিকে ইশারা করে সীতাকে বসতে বললেন। সীতা চুপচাপ বসে পড়ল।

ঘরে খেলা করছে তিনরকমের আলো। সীতার মুখে কৌতূহলের দীপ্তি। অনন্তনারায়ণের চোখে উজ্জ্বল আলো। আর সবশেষে, ফায়ার-প্লেসের চঞ্চল শিখার লাল আভা।

'সীতা, মানুষ আর নেকড়ে, দুটো জিনিসই নিশ্চয় তোমার চেনা?' নীরবতাকে ক্ষণস্থায়ী করে প্রশ্ন করলেন অনন্তনারায়ণ।

সীতা ঘাড় নাড়ল। বলল, 'চেনা, তবে নেকড়ে কখনও চোখে দেখিনি।'

অনন্তনারায়ণ বললেন, 'এখানে কাছাকাছি জঙ্গল বলতে যা আছে সেটা বদ্রীনাথ থেকে শুরু হয়েছে, চলে গেছে হনুমানচটি ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণে। তবে নেকড়ে পাওয়া যায় দক্ষিণে আশি কিলোমিটার দূরের থারালি জঙ্গলে, আর পশ্চিমে একশো কিলোমিটার দূরে উত্তরকাশীর ভাটওয়ারির জঙ্গলে, কাছাকাছি এই দুটো জায়গায়। এছাড়া বুনো কুকুর কিছু

আছে পশ্চিমের ডুয়ার্স আর গাড়োয়ালের বিস্তীর্ণ জঙ্গলে। এ জায়গা দুটোর দূরত্ব এখান থেকে একশো কিলোমিটারের কিছু বেশি হবে...'

সীতার উপস্থিত বুদ্ধি আছে। স্বামীর কথায় ও এটুকু আঁচ করতে পারল যে, তিনি ইতিমধ্যেই স্থানীয় বন জঙ্গল ও পশু নিয়ে চর্চার কাজে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছেন।

অনন্তনারায়ণ এবার সামনে ঝুঁকে এলেন। অভ্যাসমতো ডান বাঁ হাতের আঙুল চিবুকে বুলিয়ে নিলেন আলতো করে। তারপর বললেন, 'সীতা, নেকড়ে-মানুষ নিয়ে কিংবদন্তী ইওরোপ ও আফ্রিকার দেশগুলোয় বহুদিন ধরেই চালু রয়েছে। বহু ঘটনার কথাও শোনা গেছে সেখানে। যেমন আফ্রিকার মং-বাটু ওঝারা নাকি পূর্ণিমার রাতে নিজেদের পালটে ফেলতে পারে নেকড়ে-বাঘে। বুলগেরিয়ার থ্রাক উপজাতির অনেকে এই একই অলৌকিক ক্ষমতার দাবি করে। আবার কিছু কিছু মানুষের মধ্যে রূপান্তর ঘটে যায় তার অজান্তে, অনিচ্ছায়।'

ফায়ার প্লেসের আগুনের শিখা লাল আভা ছড়িয়ে দিয়েছে সীতার ফরসা সুন্দর মুখে। ওর গভীর চোখ স্বামীর চোখে স্থির। যেন মানুষটাকে ও নতুন করে চিনছে, জানছে।

অনন্তনারায়ণ আবার বলতে শুরু করলেন, 'ভারতবর্ষে নেকড়ে-মানুষের কথা তেমন শোনা যায় না। তবে একবার আসামের জঙ্গল থেকে পাওয়া একটি ছেলের কথা জানা গিয়েছিল। ছোটবেলা থেকে সে মানুষ হয়েছিল নেকড়ে পরিবারে। ফলে ছেলেটির মধ্যে কিছু কিছু নেকড়ে-সুলভ লক্ষণ দেখা গেছে। কিন্তু তাকে ঠিক নেকড়ে-মানুষ বলা যায় না। লাইক্যান্থ্রপি নিয়ে আমি যতদূর গবেষণা করেছি—'

'লাইক্যান্থ্রপি?' সীতা অস্ফুটে ছুড়ে দিল প্রশ্নটা।

অনন্তনারায়ণ হাসলেন, 'হ্যাঁ, লাইক্যান্থ্রপি, নেকড়ে-মানুষ শাস্ত্র। শব্দটা লাইক্যান্থ্রপ, অর্থাৎ নেকড়ে-মানুষ থেকে এসেছে। আর লাইক্যান্থ্রপ ইংরেজি কথাটা কোত্থেকে এসেছে জানো?'

এক মুহূর্ত থামলেন অনন্তনারায়ণ। তারপর বললেন, 'গ্রিক শব্দ লাইক্যান্থ্রোপোস্ থেকে। গ্রিক ভাষায় লাইকোস্ মানে হচ্ছে নেকড়ে, আর অ্যান্থ্রোপোস্ অর্থ মানুষ, দুয়ে মিলে লাইক্যান্থ্রোপোস্। মনে রেখো, ইওরোপের বলকান্ রাজ্যগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে গ্রিস, আলেকজান্ডারের দেশ। আলেকজান্ডারের সময়েও গ্রিকদের নেকড়ে-মানুষে বিশ্বাস ছিল। এ বিশ্বাস যে ঠিক কতটা পুরনো, তা কেউ জানে না।'

সামনে আরও ঝুঁকে বসলেন অনন্তনারায়ণ। কাঠের খাটো টেবিলের দিকে নজর নামিয়ে আঙুলে আঙুলে জট পাকালেন। গলার স্বর এক পরদা নিচু করে বলতে লাগলেন, 'সীতা, নেকড়ে-মানুষ সম্পর্কে আমার ধারণা কিন্তু আলাদা। বহুদিন ধরে মানুষের মনের রোগ নিয়ে ডাক্তারি করে আমার এই ধারণা তৈরি হয়েছে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই দুটো ব্যক্তিত্ব আছে, ভালো আর খারাপ। ডক্টর জেকিল ও মিস্টার হাইড। বিশেষ বিশেষ সময়ে মানুষ যখন নেকড়ে-মানুষে পালটে যায় তখন মূলত মিস্টার হাইডের চরিত্রটাই তার মধ্যে ফুটে ওঠে। অর্থাৎ, রূপান্তরের বেশিরভাগটাই হল মানসিক। বাকি পরিবর্তনটুকু হয় তার দেহে। তার দাঁত, নখ, গায়ের লোম, চামড়া, কণ্ঠস্বর, সবকিছুই কম-বেশি পালটে যায়। হাঁটাচলাও হয়ে ওঠে অস্বাভাবিক। আর মনটা হয়ে যায় কোনও ক্ষুধার্ত, হিংস্র, নৃশংস জন্তুর মন, হয়তো কোনও নেকড়ের মন। তাই সেই পালটে যাওয়া অমানুষটিকে আমরা বলি মানুষ-নেকড়ে বা নেকড়ে-মানুষ—'

একটা অদ্ভুত হিমেল চিৎকারে অনন্তনারায়ণ বসুরায়ের বক্তৃতায় বাধা পড়ল।

জমাট শীতের ভারী স্তরগুলো ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে কেটে ভেসে এল সেই শিরদাঁড়া-কাঁপানো শব্দ।

এ চিৎকার কোনও মানুষের নয়, কোনও পশুর নয়, কোনও প্রেতের নয়। বরং যেন এই তিনের এক শয়তানী সংমিশ্রণ।

ফায়ার প্লেসের উত্তাপ পলকে হয়ে গেল হিমেল বাতাস। সীতার সুন্দর মুখে অস্পষ্ট ছায়া। চোখের পাতা চঞ্চল ফড়িংয়ের ডানার মতো সূক্ষ্মভাবে কাঁপছে। শুধু চোখ জ্বলছে অনন্তনারায়ণের।

চকিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। প্রতিটি ইন্দ্রিয় প্রখরভাবে সজাগ করে তুললেন।

'এটা কিসের চিৎকার?' ভয়ার্ত অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করল সীতা।

'জানি না।' অনন্তনারায়ণের চোখ-কান তখনও বাইরের দিকে উন্মুখ।

গত কয়েকদিন ধরে গভীর রাতে এই ধরনের এক অমানুষিক চিৎকার আবছাভাবে শুনতে পেয়েছেন অনন্তনারায়ণ। ব্যাপারটা তিনি নিজের কল্পনা বলে ভেবেছিলেন। অষ্টপ্রহর মানুষ-নেকড়ের চিন্তায় মশগুল থাকার ফলে হয়তো কোনও দুঃস্বপ্ন নিয়মিতভাবে দেখা দেয় ঘুমের ঘোরে। কিন্তু এখন তো সবে সন্ধে! বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা মালগাড়ির চাকার মতো ঝমঝম করে গড়িয়ে যেতে লাগল।

চিৎকারটা দ্বিতীয়বার শোনা গেল।

অনন্তনারায়ণ আর দেরি করলেন না। পাশেই একটা খালি চেয়ারের ওপরে পড়ে ছিল তাঁর ভারী লোমের কোট। সেটাকে ঝটিতি গায়ে চড়িয়ে নিলেন। তারপর দ্রুতপায়ে চলে গেলেন শোবার ঘরে।

বিছানার পাশেই ড্রেসিং টেবিল। তার বাঁদিকের প্রথম ড্রয়ারটা খুলতেই চোখে পড়ল স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন ডাব্‌ল অ্যাকশন নাইন মিলিমিটার অটোমেটিক পিস্তল। উত্তরাধিকারসূত্রে বাবার কাছ থেকে পাওয়া। এখন এটা বেআইনি অস্ত্র। কিন্তু আত্মরক্ষায় ঠিকঠাক কাজ দেয়।

পিস্তলটা তৎপর হাতে তুলে নিয়ে কোটের পকেটে ভরলেন অনন্তনারায়ণ। আজ এটা হয়তো প্রথম কাজে লাগবে।

সেই মুহূর্তে চিৎকারটা তৃতীয়বার শোনা গেল।

তিনি বসবার ঘরে ফিরে আসতেই সীতা এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। স্বামীর বাহু আঁকড়ে ধরল সজোরে।

'কোথায় যাচ্ছ?'

'বাইরে!' অনন্তনারায়ণ হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন।

ভয়ার্ত সীতার হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে ভারী কাঠের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। সীতা একটা চাপা আর্তনাদ ছুড়ে দিল পিছন থেকে।

অদেখা পশুটা তখনও উন্মাদের মতো চিৎকার করে চলেছে। চিৎকারে ফেটে পড়ছে হতাশা, ক্ষোভ, ক্রোধ আর হিংসা। শীতের বাতাস কেটে কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে পড়ছে সেই অপার্থিব আর্তনাদ।

সন্ধের অন্ধকার ঘন হয়েছে। পরিষ্কার আকাশে ঝকঝকে তারা ফুটেছে। তারার আসরে প্রধান অতিথি হয়ে হাজির দ্যুতিময় পূর্ণিমার চাঁদ। চাঁদ ও তারার আলো হেসে গড়িয়ে পড়েছে ঢালু প্রান্তরে। চারপাশে ছায়া ছায়া এবড়ো-খেবড়ো পাথর, মাঝে মাঝে

সমতল সবুজ মাঠ। সবুজের কোনও কোনও অংশে ধান অথবা গমের খেত। দূরে-কাছে কয়েকটা গ্রাম্য কুটির দাঁড়িয়ে। তাদের গা ঘেঁষে কয়েকটা বার্চ, জুনিপার ও দেবদারু গাছ। শীতের বাতাসে তাদের পাতা কাঁপছে। হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে জমাট কুয়াশা। কখনও কখনও তারা স্বচ্ছ ঘোমটা টেনে দিচ্ছে চাঁদের মুখের ওপরে।

অনন্তনারায়ণের গায়ে কাঁটা দিল। উদ্‌ভ্রান্তের মতো পশুটাকে খুঁজতে লাগলেন তিনি। যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ নজর ছুড়ে দিলেন চারদিকে।

একটু পরেই তাকে আবিষ্কার করা গেল।

একটা জুনিপার গাছের নীচে একটা বড়সড় পাথরের চাঁইয়ের ওপরে বসে রয়েছে প্রাণীটা। সামনের পা দুটো খাড়া। পিছনের পা-জোড়া ভাঁজ করে আকাশের দিকে মুখ তুলে চিৎকার করছে। গাঢ় নীল আকাশের পটে প্রাণীটার অবয়ব কুচকুচে কালো ছায়া হয়ে জমাট বেঁধে রয়েছে।

অনভ্যস্ত হাতে পিস্তল উঁচিয়ে ধরলেন অনন্তনারায়ণ। প্রাণীটাকে জীবন্ত ধরার চেষ্টা করা বৃথা। তাঁকে ফাঁকি দিয়ে সহজেই ওটা পশ্চিমের খাদে নেমে যেতে পারে। কিন্তু মনে মনে তিনি চাইছিলেন, প্রাণীটা জখম হোক ক্ষতি নেই, তবে যেন মরে না যায়।

গুড়ুম!

বিকট গর্জন তুলে গুলি ছুটে গেল অনন্তনারায়ণের পিস্তল থেকে।

এক বীভৎস আর্তনাদ করে জন্তুটা পাথরের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ল নীচে। অনন্তনারায়ণ ছুটে গেলেন সেদিকে। ততক্ষণে সীতা এসে খোলা দরজায় দাঁড়িয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাসের কামড়ে ওর কমনীয় দেহ থরথর করে কাঁপছে।

জন্তুটার কাছে পৌঁছে অনন্তনারায়ণ বেশ অবাক হলেন। চিৎকার শুনে এবং ছায়াময় আকৃতি দেখে তিনি প্রাণীটাকে নেকড়ে বলেই আঁচ করেছিলেন। কিন্তু এখন দেখলেন তাঁর অনুমান পুরোপুরি ঠিক নয়।

লোমশ প্রাণীটা কাত হয়ে ঘাসের ওপরে পড়ে আছে। সবুজ চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। শক্ত চোয়াল ফাঁক হয়ে রয়েছে। দেখা যাচ্ছে ঝকঝকে ধারালো দাঁতের হিংস্র সারি। মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে। আকৃতি-প্রকৃতি দেখে নেকড়ে বলেও মনে হয়, আবার বুনো কুকুর বলেও মনে হয়। হয়তো এই দুইয়ের সংকরও হতে পারে।

না, প্রাণীটা মরেনি। চোখের চাউনিই বলে দিচ্ছে ওটা জখম হলেও বেঁচে আছে। পিস্তল কোটের পকেটে রেখে অনন্তনারায়ণ ঝুঁকে পড়লেন আহত প্রাণীটার ওপরে। দু'-হাতে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলেন। তাঁর ডান হাতটাকে মুখের সামনে পেয়ে প্রাণীটার চোখজোড়া ধকধক করে উঠল। হিংস্রভাবে কামড় বসাতে চাইল। কিন্তু অল্পের জন্য ফসকে গেল ওটার আক্রমণ। দাঁতে দাঁতে সংঘর্ষ হল সশব্দে। সাদা ফেনা ছিটকে পড়ল।

অনন্তনারায়ণ খুব খুশি হলেন মনে মনে। আগুন নিয়ে খেলা করতে তিনি ভালোবাসেন। তেজিয়ান হিংস্র পশুটা তাঁর গবেষণায় কাজে লাগবে। নিজের সৌভাগ্যে ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন তিনি। প্রাণীটাকে নিয়ে বাড়ির দরজায় যখন পৌঁছলেন তখন তাঁর লোমের কোট, হাত, পা রক্তে মাখামাখি।

তাঁকে দেখে দরজায় দাঁড়ানো সীতা ভয়ে চিৎকার করে উঠল। সবচেয়ে কাছাকাছি গ্রাম্য কুটির থেকে গাড়োয়ালি ভাষায় প্রশ্ন ছুটে এল, 'কী হয়েছে, বাবু? গুলির আওয়াজ কেন?'

অনন্তনারায়ণ হিন্দিতে উত্তর দিলেন, 'ও কিছু নয়, একটা বুনো কুত্তা জখম করেছি।'

তারপর সীতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভেতরে চলো। এটাকে সারিয়ে তুলতে হবে।'

আহত প্রাণীটা তখন সবুজ চোখের ধারালো নজরে সীতাকে দেখছিল।

সে-রাতে ভালো ঘুম হল না দু'জনের। কারণ পাশের ঘরে পড়ে থাকা আহত প্রাণীটা সারারাত এক অদ্ভুত চাপা স্বরে চিৎকার করেছিল।

ঠিক সাতদিন পরে এক মনোরম বিকেলে ক্যাপ্টেন মথুর সিংয়ের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল সীতার। আলাপের পর ঘটনাপ্রবাহ্ যে কোনদিকে মোড় নেবে সেটা সেই মুহূর্তে তিনজনের কেউই বুঝতে পারেনি।

গত সাতটা দিন সীতার খুব ক্লান্তভাবে কেটেছে—বিশেষ করে রাতগুলো।

পাহাড়ী নির্বাসনের প্রস্তাবে প্রথম প্রথম ওর ভালোই লেগেছিল। এক বিচিত্র রোমাঞ্চকর মধুচন্দ্রিমার দিকে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে ছিল ও। এবং ওর আশা-প্রত্যাশা ষোলো আনাই পূর্ণ হয়েছে। একান্তে নিভৃতে অন্তরঙ্গভাবে সময় কাটিয়েছে ওরা দু'জনে। সেই অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলোয় অনন্তনারায়ণের উৎসাহ বা উদ্দীপনার তেজ সীতাকে ছাপিয়ে না গেলেও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। এছাড়া আশপাশের পর্বতমালা, তৃণভূমি, গাছগাছালি, বহুরকম পাখি ও গ্রাম্য মানুষগুলো এক অদ্ভুত পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছিল ওদের দু'জনের জন্য। শহুরে সমাজের দুই প্রতিনিধির সঙ্গে অবিরত ভাববিনিময় হয়ে যাচ্ছিল অশিক্ষিত গাঁইয়া গাড়োয়ালি মানুষগুলোর। ধীরে ধীরে ওরা একে অপরকে মেনে নিয়েছিল। অনন্তনারায়ণ ও সীতা হয়ে পড়েছিল ওদেরই দেশের মানুষ। ওদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে সবার সুখ-দুঃখ মিলেমিশে যাচ্ছিল। কিন্তু জীবনযাত্রায় সুর কেটে গেল সেই ভয়ঙ্কর রাতের ঘটনায়।

একটা আহত নেকড়ে এসে দাঁড়াল ওদের দু'জনের মাঝখানে। তৈরি হয়ে গেল এক পাশবিক প্রাচীর।

প্রাণীটাকে অনন্তনারায়ণ নেকড়ে বলেই ধরে নিলেন—যদিও ওটার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বুনো কুকুরের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। গুলি লেগেছিল পিছনের ডান পায়ের ওপরদিকটায়। নাইন মিলিমিটারের ভারী বুলেট। ফলে আঘাত হেলাফেলার নয়। প্রায় দু'-ঘণ্টা ধরে পশুটিকে শুশ্রূষা করলেন অনন্তনারায়ণ। তারই ফাঁকে ফাঁকে সীতাকে ফরমাশ : জল গরম করো, ছুরি দাও, ব্যান্ডেজ দাও, আরও কত কী!

সীতা অবাক হয়ে স্বামীকে দেখছিল। আর দেখছিল আহত পশুটাকে। এখন কেমন যেন নির্জীব হয়ে পড়েছে। তবে আধবোজা সবুজ চোখে হিংসার জ্বালা ঠিকরে বেরোচ্ছে।

ধাতস্থ হতে অনেকক্ষণ সময় নিল সীতা। তারপর ইতস্তত করে জানতে চাইল, 'এটা কি নেকড়ে?'

অনন্তনারায়ণ পশুটার আহত পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে বললেন, 'অনেকটা তাই বলতে পারো...'

'তুমি যে কিছুক্ষণ আগে বলছিলে এখানে আশেপাশে নেকড়ে নেই!'

'নেই বলেই তো জানতাম।' অন্যমনস্ক স্বরে জবাব দিলেন অনন্তনারায়ণ।

'আর মানুষ-নেকড়ে ?'

চকিতে চোখ তুলে তাকালেন বিজ্ঞানী অনন্তনারায়ণ। দুর্জ্ঞেয় হাসি হাসলেন। বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি !'

সীতা ভয় পেল। স্পষ্ট বুঝল, একটা নেকড়ে হাতে পেয়ে ওর স্বামী যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। এক কালান্তক নেশা চকচক করছে তাঁর দীপ্ত চোখের তারায়। ওই আহত প্রাণীটার সবুজ চোখ দুটোর মতো।

দিনের পর দিন ভয়টা দানা বাঁধতে লাগল, জমাট বাঁধতে লাগল পাথরের মতো। আর অনন্তনারায়ণ ভূতে পাওয়া মানুষের মতো এগিয়ে চললেন গবেষণার আয়োজন নিয়ে।

পরদিন বাড়ির লাগোয়া একটা বড়সড় ঘর তৈরি করালেন। ঘরের মধ্যে তৈরি হল ছোট ছোট ছ'টা খুপরি। খুপরির দরজাও লাগিয়ে দিলেন কাঠের তক্তা দিয়ে। তারপর একটা খুপরিতে নেকড়েটাকে বন্দি করলেন। জন্তুটার গর্জন তখন আরও হিংস্র হয়ে উঠল। কিন্তু আহত পা নিয়ে ওটা তেমন দাপাদাপি করতে পারল না।

অথচ দু'দিন পেরোতে না পেরোতেই পশুটা সুস্থ হয়ে উঠল। আর ওটার আচরণও হয়ে উঠল কিছুটা শান্ত।

অনন্তনারায়ণ খুশি হলেন। কারণ পূর্ণিমা অতিক্রান্ত হয়ে কৃষ্ণপক্ষ শুরু হয়ে গেছে। তাঁর ধারণা অনুযায়ী পূর্ণিমার রাতেই অমানুষিক লক্ষণগুলো তীব্র হয়। সীতার সঙ্গে এ-নিয়ে কোনও আলোচনা করলেন না তিনি। ওই একটা দিনই ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে স্ত্রীর কাছে মুখ খুলেছিলেন গবেষণার বিষয়ে। আর নিয়তির কী অদ্ভুত খেলা! তাঁর সুপ্ত বাসনার কথা টের পেয়ে যেন নিয়তি-প্রেরিত হয়ে সেইদিনই তাঁর বাড়ির কাছে এসে হাজির হল হিংস্র জন্তুটা। নেশার জিনিস হাতে পেয়ে সীতাকে ভুললেন অনন্তনারায়ণ।

আর এই প্রথম সীতা একটা ঝাঁকুনি খেল। ও যেন একা হয়ে গেল রাতারাতি। ওর মনটা আবার অস্থির হয়ে উঠতে লাগল। বিয়ের আগে যে-অস্থিরতা সারিয়ে তুলতে ও ডাক্তার অনন্তনারায়ণের কাছে গিয়েছিল, এখন সেই অসুখটাই আবার ফিরে এল যেন। আমল না দিতে চাইলেও আহত জন্তুটার প্রতি কেমন এক চাপা ঈর্ষার ধারা বয়ে চলল সীতার মনের গভীরে। কখনও কখনও সেই ঈর্ষার ধারা উঠে আসতে চায় ওপরে, প্রপাত হয়ে ফেটে পড়তে চায়।

এরপর থেকেই সকালে-বিকেলে একা একা বেড়াতে বেরনোটা সীতার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। যেন ও শহর থেকে আসা কোনও ট্যুরিস্ট। শীতের পোশাকে সর্বাঙ্গ মুড়ে কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে উদ্দেশ্যহীন একাকী ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে সীতা। কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও বাসে বা জিপে চড়ে ও চলে যায় চামোলি বা যোশীমঠের দিকে। তখন ও ভুলে যেতে চায় স্বামীর কথা, নেকড়ের কথা, মানুষ-নেকড়ের কথা। তখন ও হয়ে ওঠে নাম-পরিচয়হীন কোনও সুন্দরী যুবতী—যে প্রকৃতির সৌন্দর্যে আয়েসী চুমুক দিতে চায়।

একদিন বিকেলে এইরকম এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছিল সীতা। আলু, গম, ধানের ছোট ছোট খেতে গাঁয়ের মেয়েরা কাজ করছে। বাতাস ক্রমশ ঠাণ্ডা হচ্ছে। রোদের তেজ স্তিমিত হয়ে কুয়াশা জমাট বাঁধছে। পায়ে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে অলকানন্দা নদীর কাছে এসে দাঁড়াল ও। নদী, কিন্তু মাত্র পনেরো ফুট চওড়া। কুলু-কুলু স্বচ্ছ নীলাভ জল খরস্রোতে বয়ে চলেছে। জলের নীচে পড়ে থাকা নুড়ি-পাথরগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। সীতার খুব ভালো লাগছিল। এখানে এসে স্থায়ী বসবাস শুরু করার পর মাত্র দু'দিন নদী

দেখতে এসেছিল। আশ্চর্য, তখন কিন্তু নদীর সৌন্দর্য এমন করে চোখে পড়েনি।

ক্যামেরা বের করে তাক করল সীতা। চঞ্চল নদীর ছবি তুলল। ফিল্ম ঘুরিয়ে দ্বিতীয় ছবি তুলতে যাবে, হঠাৎ পিছন থেকে একটা ভারী গলা পাওয়া গেল। পরিষ্কার হিন্দিতে কেউ বলে উঠল, 'সরি ম্যাডাম, এখানে ছবি তোলা নিষেধ—মিলিটারি এলাকা, তাই বারণ আছে!'

সীতা চমকে ঘুরে দাঁড়াল।

মিলিটারি পোশাকে এক সুন্দর সুঠাম যুবক। মুগ্ধ করার মতো স্বাস্থ্য, ফরসা রঙ রোদে পুড়ে কিছুটা তামাটে, চকচকে চোখ যেন কথা বলছে, চওড়া গোঁফের নীচে সুন্দর ঠোঁটের গড়ন, চিবুকের ডানদিকে একটা পুরনো কাটা দাগ।

কিছুটা দূরে পাহাড়ী সড়কের ওপরে একটা মিলিটারি জিপ দাঁড়িয়ে। জিপে চালকের আসনে উর্দি পরা আর একজন পুরুষ বসে আছে। দূর থেকে তার চোখ-মুখ তেমন ঠাহর করা যাচ্ছে না।

সীতার খেয়াল হল, একটু আগেই দূরের সড়কে ধুলো উড়িয়ে একটা গাড়ি আসতে দেখেছিল ও। এই জিপটাই তাহলে আসছিল!

নিজের অজান্তেই অপলকে যুবকটির দিকে তাকিয়ে ছিল সীতা। যুবকটির দিক থেকে এক অদ্ভুত মদির সুবাস এসে পৌঁছচ্ছিল ওর নাকে। ওকে পাগল করে দিচ্ছিল। এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ ওকে কোণারক সূর্য মন্দিরের কিংবদন্তীর চুম্বকের মতো টানছিল। টানছিল।

জিপের চালক অধৈর্য হয়ে দু'বার হর্ন দিল।

সীতার ঘোর ভাঙল। বলল, 'দুঃখিত, মিস্টার...'

'মথুর সিং। ক্যাপ্টেন মথুর সিং। মানার ক্যাম্পে আমি আছি।' হেসে উত্তর দিল যুবক। তারপর পিছন ফিরে জিপের চালককে লক্ষ করে গলা উঁচিয়ে বলল, 'এক মিনিট—যাচ্ছি।'

বদ্রীনাথ থেকে তিন কিলোমিটার ওপরে অলকানন্দা উপত্যকায় এক থিতু ধসের ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে মানা গ্রাম। শীতের সময়ে গ্রাম খালি করে সব গ্রামবাসী নেমে আসে যোশীমঠ ও চামোলিতে, মানা ঢেকে যায় ঘন তুষারে। শুধু মিলিটারি ক্যাম্প অক্লান্ত পাহারায় থাকে। কারণ একটু দূরেই ভারতের সীমান্তরেখা।

এই অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষই চাষবাস কিংবা পশুপালন করে পেট চালায়। ইদানীং নতুন কয়েকটা রাস্তাঘাট তৈরি হয়েছে, মিলিটারিদের ব্যস্ততা বেড়েছে।

সীতা ইতস্তত করে বলল, 'আপনি হয়তো আমাকে ট্যুরিস্ট ভাবছেন, ক্যাপ্টেন সিং...।' ও চাইছিল আলাপচারী যেন দীর্ঘ হয়। ওর একঘেয়েমি ওকে আরও বেপরোয়া বেহিসেবি করে তুলছিল। একটু থেমে ও বলল, 'আমি কিন্তু ট্যুরিস্ট নই। গোপেশ্বরেই আমি থাকি।'

'মাই গড! ইজ ইট?' বিস্ময় ফেটে পড়ল মথুর সিংয়ের চোখে-মুখে। সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সীতার সৌন্দর্য দেখছিল। বলল, 'কদ্দিন এসেছেন এখানে? আর কে আছে?'

'এসেছি মাস কয়েক। আর সঙ্গে আছেন...।' একটু থেমে মথুর সিংয়ের চোখে চোখ রাখল সীতা। তারপর বলল, 'আমার স্বামী...'

পলকের জন্য একটা অপ্রস্তুত ভাব ফুটে উঠল ক্যাপ্টেন সিংয়ের মুখে। কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে সহজ স্বাভাবিক করে নিল।

'তা হঠাৎ এই পাহাড়ী গাঁয়ে ? কোনও কাজে এসেছেন নিশ্চয়ই ?'

'উঁহু, কোনও কাজ নয়। বাকি জীবনটা হয়তো এখানেই থেকে যাব আমরা...'

মথুর সিং আবার অবাক হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, সীতা তাকে বাধা দিয়ে মন্তব্য করল, 'আমার স্বামী বিজ্ঞানী।'

যেন এটুকু খবরেই ওদের বাকি জীবন এখানে কাটানোর একটা স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।

জিপ থেকে আবার হর্ন বেজে উঠল।

মথুর সিং বলল, 'আমরা তো চাকরির দায়ে এখানে আছি। তা বলে আপনি...সত্যি, অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে করছে...'

'রোজ বিকেলে আমি এদিকটায় বেড়াতে আসি। একা ভালো লাগে না।' সীতা চোখ তুলে কেমন একটা উদাস ভঙ্গি করল।

'চলি ম্যাডাম।' যাওয়ার জন্য তৈরি হল মথুর সিং।

সীতা বলল, 'ক্যামেরার ফিল্মটা খুলে নিলেন না ? একটা ছবি তুলেছি কিন্তু...'

'মুলতুবি থাক। আপনি তো আর পালিয়ে যাচ্ছেন না !'

তারপর দু'জনেই হাসল।

আবার বাজল জিপের হর্ন। মথুর সিং ঘুরে দাঁড়িয়ে চটপট পা চালাল জিপের দিকে।

জিপে পৌঁছতেই চালক ধূর্ত হেসে বলল, 'কি মথুরজী, চিড়িয়া ধরা দিল ?'

মথুর সিং চালকের পাশে গিয়ে বসল। তাকে এখন তেমন সরল বলে মনে হচ্ছে না। ঠোঁটের কোণে হেসে সে বলল, 'ভগবানের দয়ার শেষ নেই। বান্দার জন্যে এই সুনসান রুখু জায়গাতেও এরকম ভরপুর চিজ পাঠিয়ে দিয়েছে।'

দু'জনেই হাসিতে ফেটে পড়ল। জিপ স্টার্ট নিল। জিপের গর্জনের শব্দ ছাপিয়ে একটা ঠুনঠুন শব্দ শোনা যাচ্ছিল। জিপের পিছনদিকে রাখা চারটে মদের বোতল পরস্পরের গায়ে ঠোকাঠুকি লেগে শব্দ হচ্ছিল।

জিপটা ছুটে চলল। মথুর সিংয়ের চোখের সামনে সীতার বাঁধভাঙা যৌবন ভাসছে, কেবল ভাসছে। সে বলল, 'দেবীদয়াল, এ জিনিসের ভাগ চেয়ো না ইয়ার।'

জওয়ান দেবীদয়াল হাসল, 'ভাগ লাগবে না, গুরু। তবে সেকেন্ড হ্যান্ড হয়ে গেলে আমার কথা ইয়াদ রেখো।'

তারপর চলন্ত জিপে আবার গলা ফাটিয়ে হাসি।

এবড়োখেবড়ো পথ ধরে জিপ এগিয়ে চলল সরস্বতী উপত্যকার দিকে।

সীতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপসৃয়মান জিপের রেখে যাওয়া ধুলো ও ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখছিল। ওর সারা শরীরে এক দারুণ জ্বালা।

গোধূলি নেমে আসছে। বার্চ গাছে, জুনিপার গাছে, হলদে বনফুলের ঝোপে ছায়া জমাট বাঁধছিল। শীত আরও তীক্ষ্ণ, আরও তীব্র হচ্ছে। অথচ সীতার কোনওদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, খেয়াল নেই। শরীরের জ্বালাপোড়ায় ইচ্ছে করছিল অলকানন্দার বরফ-ঠাণ্ডা জলে মুখ-চোখ ধুয়ে নেয়।

তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে রওনা হল সীতা। চাষবাস ছেড়ে মেয়ের দল ঘরে ফিরছে। কয়েকটা কুঁড়ে থেকে টিমটিমে লণ্ঠনের আলো চোখে পড়ছে। কানে আসছে নিঃসঙ্গ পাখির ডাক।

বাড়ি ফিরেই স্বামীকে খুঁজে বের করল সীতা। নতুন তৈরি ঘরে খাঁচার কাছে বসে

নেকড়েটাকে লক্ষ করছিলেন অনন্তনারায়ণ। একটা খাতার পাতায় কীসব লিখে নিচ্ছিলেন।

সীতা তাঁকে স্পর্শ করল, ডাকল, 'এসো।'

অনন্তনারায়ণ অবাক হয়ে স্ত্রীকে দেখলেন। ফরসা মুখ টকটক করছে।

সীতা হাত ধরে টানল, 'এসো !'

তাঁকে শোবার ঘরে নিয়ে গেল সীতা। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে এক ঝটকায় লাফিয়ে পড়ল স্বামীর ওপর। জামাকাপড় বেশবাস সব এলোমেলোভাবে খুলে তাঁকে টেনে নিয়ে ফেলল বিছানায়। ভারী লেপের নীচে আশ্রয় নিয়ে দুটো শরীর মেতে উঠল প্রতিযোগিতায়। কে কাকে হারাতে পারে তারই প্রতিযোগিতা।

সীতা পাগলের মতো স্বামীর দেহকে আদর করছিল। আঁচড়ে, কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলছিল। আর ওদের শরীর দুটো এক অচ্ছেদ্য বাঁধনে যুক্ত হয়ে দাপাদাপি করছিল মুক্ত হওয়ার জন্য। কিন্তু পারছিল না।

ফায়ার প্লেসের লালচে শিখা কাঁপছিল। বড় বড় শ্বাস নিচ্ছিল বিছানার শরীর দুটো। সীতার জ্বালাপোড়া ভাবটা ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসছিল। অনন্তনারায়ণ কোনওরকমে পাল্লা দিচ্ছিলেন বউয়ের সঙ্গে। প্রেমদংশন সীতার স্বভাব। মাঝে মাঝে তা করেও থাকে ও। কিন্তু আজকের দংশনের তীব্রতার কোনও তুলনা নেই।

ভালোবাসার উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছে অনন্তনারায়ণ যখন পাগলের মতো সুখের চাবিকাঠি খুঁজে বেড়াচ্ছেন সীতার শরীরের অভ্যন্তরে, ঠিক তখনই নেকড়েটার চাপা চিৎকার একটানা ভেসে এল বাতাসে। পাগল-করা মুহূর্তে পৌঁছে অনন্তনারায়ণের ঘাড়ে জোরে দাঁত বসিয়ে দিল সীতা। ওর আচ্ছন্ন চোখের সামনে সুদর্শন মথুর সিংয়ের মুখশ্রী ভাসছিল।

কামড়ের যন্ত্রণা টের পেলেন না অনন্তনারায়ণ। তিনি শুধু ভাবছিলেন, চাঁদের কলার হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে মানুষের কামনা-বাসনার কোনও গূঢ় সম্পর্ক আছে কি না !

আরও তিনটে লোমশ কুকুর জোগাড় করলেন অনন্তনারায়ণ।

উত্তরপ্রদেশে এসে স্থির হয়ে বসার পরেই বীরদেও নামে স্থানীয় এক গাড়োয়ালি প্রৌঢ়ের সঙ্গে ভাব জমেছিল অনন্তনারায়ণের। লোকটা সবসময় গাঁজার নেশায় টঙ হয়ে থাকে। তবে কাজের লোক। ট্যুরিস্ট বা তীর্থযাত্রীদের টাট্টুর পিঠে চড়িয়ে বদ্রীনাথ দর্শনে নিয়ে যায়। নীলকণ্ঠ আর চৌখাম্বা অভিযানে যেসব পাহাড়-অভিযাত্রী আসে তাদের সঙ্গে চলে যায় কুলি এবং গাইড হিসেবে। এছাড়া আর একটা উপার্জনের পথ আছে বীরদেওর : প্রতিবেশীদের ভেড়া, ছাগল বা চমরী গাই চুরি করে যোশীমঠে বিক্রি করা।

প্রথম আলাপের পরই নিজের সম্পর্কে সব কথা গড়গড় করে বলে ফেলেছিল বীরদেও। চুরি ও গাঁজার অভ্যাসের কথা পর্যন্ত বাদ দেয়নি। লোকটির অকপট সরলতা মুগ্ধ করেছিল মনোবিজ্ঞানী অনন্তনারায়ণকে। ফলে তাঁর সংসার পত্তনের খাটাখাটুনির একটা বড় দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন বীরদেওর হাতে। তাঁর কেন যেন মনে হয়েছিল, বীরদেওর ওপরে নির্ভর করা যায়, বিশ্বাস রাখা যায়। আর লোকটা কাজ করে তার প্রমাণও দিয়েছিল।

ভাঙা গাল, খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি, ঘোলাটে চোখ রক্তবর্ণ, পরনে ছেঁড়া তালি-মারা ময়লা শ্যাওলা-সবুজ উলেন কাপড়ের লং কোট, চাপা কালো ফুলপ্যান্ট, মাথায় গাড়োয়ালি টুপি। সামান্য কুঁজো হয়ে হাঁটে।

বীরদেওর এই চেহারা ও চালচলন দেখলে মনে হয় না ওর শরীরে এতটুকু শক্তি আছে। অথচ ব্যাপারটা ঠিক উলটো। অনন্তনারায়ণের বাড়ির বা বাগানের কাজে বীরদেও যখন হাত লাগায় তখন ওর শারীরিক ক্ষমতা দেখে অনন্তনারায়ণ ও সীতা, দু'জনেই অবাক হন।

স্বামী-স্ত্রীর সুবিধে-অসুবিধে খেয়াল রাখত বীরদেও। যখন-তখন দু'-পাঁচ টাকা নিয়েও যেত অনন্তনারায়ণের কাছ থেকে। কখনও বা নেশা-ভাঙ করে তাঁদের বাড়ির দরজায় এসে বসে থাকত। ভাঙা জড়ানো গলায় দেশোয়ালি সুরে গান ধরত চিৎকার করে। আবার কখনও কখনও সোজা উধাও হয়ে যেত গোপেশ্বর থেকে। তখন চালচুলোহীন এই মানুষটার খবর আর কেউ রাখত না। কেউ বলত যোশীমঠ গেছে, কেউ বলত বদ্রীনাথ গেছে, কেউ বলত পাহাড়ে রওনা হয়েছে, কেউ-বা বলত জঙ্গলে ঢুকেছে। কিন্তু দিন সাত-দশ বাদে ফিরে আসত বীরদেও। ময়লা দাঁত বের করে হেসে বলত, 'পেটের ধান্দায় গিয়েছিলাম, বাবু।'

বীরদেও একটানা বেশ কিছুদিন উধাও ছিল। ফলে আহত নেকড়েটার খবর ও জানতে পারল আটদিন পরে। তখন ও উৎসাহ নিয়ে লেগে পড়ল খাঁচাগুলোর পিছনে। নেকড়েটা নিয়ে অবাক হয়ে নানান মন্তব্য করল। আর বারবার জিগ্যেস করতে লাগল, বাকি খাঁচাগুলোয় কোন জানোয়ার রাখা হবে। সাহেব কি বাড়িতে চিড়িয়াখানা খোলার কথা ভাবছেন? তাহলে ভালোই হবে। এ অঞ্চলে তো চিড়িয়াখানা নেই, ট্যুরিস্টদের দেখিয়ে মোটা টাকা আয় করা যাবে।

অনন্তনারায়ণ সামান্য হেসেছেন। তারপর পঞ্চাশটা টাকা বীরদেওর হাতে দিয়ে বলেছেন, 'বীরদেও, আমার তিনটে কুকুর দরকার। বেওয়ারিশ কুকুর হলেই ভালো হয়।'

বীরদেও তো এককথায় রাজি।

বেওয়ারিশ কুকুর হলে কেন ভালো হয় তা বীরদেও বোঝেনি। যেসব কুকুরের মধ্যে জলাতঙ্ক রোগের সম্ভাবনা বেশি সে-ধরনের কুকুরই অনন্তনারায়ণ চাইছিলেন। তাহলে পরস্পরকে কামড়ে ওরা জলাতঙ্ক রোগ সংক্রামিত করতে পারবে। তারপর...

তারপর কী হবে, কী হতে পারে, তা অনন্তনারায়ণ জানেন না। তবে জানতে ভীষণ ইচ্ছে করে।

পাঁচদিনের মধ্যেই তিনটে কুকুর জোগাড় করে দিল বীরদেও। এখানকার বেওয়ারিশ কুকুরগুলোর চেহারা এত চমৎকার আর বড় বড় লোমে ঢাকা যে, দেখলে পোষা আদুরে কুকুর বলে মনে হয়। নেকড়েটার পাশের খুপরিগুলোয় কুকুর তিনটে আলাদা আলাদা ভাবে রেখে দিল ও। অবাক হয়ে বীরদেও লক্ষ করল, কুকুরগুলো সবসময় থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকে। যেন কোনও বিজাতীয় বিপদের গন্ধ পেয়ে বিপদটা আঁচ করার চেষ্টা করে।

অনন্তনারায়ণ খাঁচার সামনে হাজিরা দেন নিয়মিত। তাঁর হাতে থাকে খাতা। তাতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিখে নেন জন্তুগুলোর আচার-আচরণ। আর মনে মনে ভাবেন সীতার আচার-আচরণের আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ। ওর জন্যও কি একটা খাতা ব্যবহার করবেন?

সেদিন সন্ধ্যায় ক্ষিপ্তের মতো দেহমিলনের পর থেকেই সীতা যেন অন্য নারী। কথাবার্তা অনেক কমে গেছে আগের চেয়ে। ইদানীং ও বাইরে ঘোরাফেরা করে বেশি। যখন ফেরে তখন ওর চোখে-মুখে থাকে এক অদ্ভুত উত্তেজনার ছাপ। কথা বলতে গেলে অগোছালো হয়ে পড়ে।

দিনকয়েক আগে রাতে খাবার টেবিলে বসে সীতা হঠাৎ বলল, 'জানো, এখানে ফটো তোলা বারণ?'

'জানি। মিলিটারি এরিয়া, বারণ তো হবেই।' অনন্তনারায়ণ গম্ভীর স্বরে বললেন।

'কাল অলকানন্দার জল আরও বেশি নীলচে লাগছিল—'

চমকে বউয়ের দিকে তাকালেন অনন্তনারায়ণ। দু'-এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দেখলেন। তারপর ছোট্ট করে জবাব দিলেন, 'হুঁ—'

'এখানকার বুনো গাছে কী সুন্দর হলদে ফুল!' হাসিখুশি মুখে বলে উঠল সীতা।

অনন্তনারায়ণ কোনও উত্তর দিলেন না।

নতুন ঘর থেকে নেকড়েটার ভয়ঙ্কর হিমেল চিৎকার শোনা গেল।

সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া ফেলে টর্চ হাতে ছুটে গেলেন তিনি। যাওয়ার সময়ে বসবার ঘরের টেবিল থেকে খাতা ও কলম নিতে ভুললেন না। বুকের ভেতরে চিৎকারটা তিনি বারবার শুনতে পাচ্ছিলেন।

রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলেন অনন্তনারায়ণ।

স্বপ্ন নয়, দুঃস্বপ্ন।

তিনি একাকী দাঁড়িয়ে আছেন এক অজানা-অচেনা পার্বত্য উপত্যকায়। শুনতে পাচ্ছেন মানুষ-নেকড়ের তীব্র গর্জন। এক অসহ্য জ্বালায় ওরা চিৎকার করে চলেছে।

আনন্দে ও আতঙ্কে অনন্তনারায়ণ কাঁপতে লাগলেন।

গর্জন আরও তীব্র হল, আরও কাছে শোনা গেল। একই সঙ্গে বেড়ে গেল তাঁর কাঁপুনি। আনন্দ স্তিমিত হয়ে শুধু জেগে রইল আতঙ্ক। মনে হল, মানুষ-নেকড়েগুলো যেন কতদিন ধরে উপোসী। আজ ওরা পেয়েছে একজন একা মানুষকে। চারদিক অন্ধকার। আকাশে পূর্ণিমার ফ্যাকাসে চাঁদ। এবড়োখেবড়ো জমিতে লম্বা লম্বা ঘন কালো ছায়া, দূরে-অদূরে মাথা তুলে রয়েছে ত্রিভঙ্গমুরারি গাছের কঙ্কাল।

স্বপ্নের মধ্যে দৌড়তে শুরু করলেন অনন্তনারায়ণ। পাগলের মতো তিনি ছুটে পালাচ্ছেন, রুক্ষ গাছের ডাল চাবুক মারছে মুখে, অক্টোপাসের শুঁড় হয়ে শেকড়গুলো পা জড়িয়ে ধরছে। তিনি হাঁপাচ্ছেন, ঘামছেন। চেষ্টা করেও তত জোরে ছুটতে পারছেন না। পিছনেই ক্রুদ্ধ গর্জন, অনুসরণ করে ক্রমশ কাছে, আরও কাছে, এগিয়ে আসছে।

অবশেষে একটা কুৎসিত খাদের ধারে এসে দাঁড়ালেন অনন্তনারায়ণ। পালাবার আর পথ নেই। আকাশে পাণ্ডুর চাঁদ হা-হা করে হাসছে। খাদের ধারে একটা নিষ্পত্র বটগাছ। বয়েসের ভারে জরাগ্রস্ত। মরিয়া হয়ে গাছ বেয়ে উঠতে শুরু করলেন। ঘষা লেগে হাত-পা ছড়ে যাচ্ছে। পা ফসকে বারবার নেমে যাচ্ছেন নীচে। তবু প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টায় ঘাটতি নেই। ছায়ার গভীর থেকে ছায়া ছায়া প্রাণীগুলো ছিটকে বেরিয়ে এল বিদ্যুতের মতো। ওদের গর্জনে ক্ষুধার্তের উল্লাস। চোখে পড়ল হলদে-সবুজ চোখের ঝিলিক, হিংস্র শ্ব-দন্তের চমক।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলেন অনন্তনারায়ণ। আরও ওপরের ডালে উঠে যেতে চেষ্টা করলেন। অথচ বুঝতে পারছিলেন দেরি হয়ে গেছে। ঠিক তক্ষুনি নেকড়ে-মানুষগুলো তাঁর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

নৃশংস দাঁত-নখের কবলে পড়ে অনন্তনারায়ণ আবার চিৎকার করে উঠলেন।

নেকড়েগুলো নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে টেনে নামাল গাছ থেকে। তিনি চিৎকারের পর চিৎকার করে যাচ্ছেন, ছটফট করে গড়াগড়ি যাচ্ছেন মাটিতে। অসংখ্য ধারালো দাঁত তাঁর শরীরে ছোবল বসাল। ক্ষুধার্ত চোয়ালগুলো প্রতি কামড়ে পাগলের মতো মাংস খুবলে নিচ্ছে অনন্তনারায়ণের শরীর থেকে। হাত-পা ছুড়ে কোনওরকমে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছেন। আর একই সঙ্গে ভাবছেন চেতনা সম্পূর্ণ লোপ পেতে কতক্ষণ লাগবে।

এমন সময় একটা বড়সড় হিংস্র চোয়াল গর্জন করে কামড় বসাল তাঁর গলায়...

'ওঠো! ওঠো!'

অনন্তনারায়ণ চোখ খুললেন। সীতা আতঙ্কিত সুরে তাঁকে ডাকছে।

জন্তুগুলোর বীভৎস মুখের পর সীতার সৌন্দর্য-স্নিগ্ধ মুখ অনন্তনারায়ণকে একটা ধাক্কা দিল। প্রচণ্ড শীতেও তিনি ঘামছেন। এখনও যেন শুনতে পাচ্ছেন ক্ষুধার্ত পশুগুলোর হিংস্র গর্জন। উত্তেজনা কমিয়ে নিজেকে সামলে নিতে কিছুক্ষণ সময় লাগল। তারপর ভাঙা, জড়ানো স্বরে জিগ্যেস করলেন, 'কী ব্যাপার?'

সীতা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই উত্তর পেয়ে গেলেন অনন্তনারায়ণ।

খাঁচা-ঘরের দিক থেকে অমানুষিক হিংস্র গর্জন ভেসে আসছে। শুধু নেকড়েটা নয়, একাধিক পশুর গর্জন যেন শোনা যাচ্ছে।

অনন্তনারায়ণ এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। ভারী ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে ক্ষিপ্র পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার আগে সীতাকে বললেন, 'ভয় নেই। তুমি ঘুমোও। আমি আসছি।'

বালিশের পাশে রাখা হাতঘড়ি দেখল সীতা। রাত দুটো। হিংস্র গর্জন এখনও শোনা যাচ্ছে। ও আবার লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। স্বামী যে হিংস্র জন্তুগুলোর সামনে গিয়ে কোনও বিপদে পড়তে পারেন এমন আশঙ্কা সীতার মনে এতটুকু জায়গা পেল না। বরং ও চোখ বুজতেই মথুর সিং ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। হাসতেই লাগল।

অনন্তনারায়ণ খাঁচা-ঘরে ঢুকতেই একটা জান্তব গন্ধ তাঁর নাকে ঝাপটা মারল। গন্ধটা আগেও পেয়েছেন, তবে আজ যেন বড় বেশি উগ্র।

একটা লণ্ঠন ঘরে সবসময় জ্বলে, কারণ ঘরটা এমনিতেই বড় অন্ধকার। দিনের বেলা দুটো ছোট ছোট জানলা দিয়ে রোদ ঢোকে। রাতে শুধু লণ্ঠনের মলিন শিখা।

ঘরে ঢুকেই লণ্ঠনের শিখা বাড়িয়ে দিলেন অনন্তনারায়ণ। নাকে জান্তব গন্ধ, কানে পাগল-করা গর্জন। কিন্তু আলোর শিখা সতেজ করে যে-দৃশ্য দেখলেন তাতে পাথর হয়ে গেলেন।

আঁকাবাঁকা কাঠের তক্তা দিয়ে খুপরি বা খাঁচাগুলো তৈরি করেছিল বীরদেও। তক্তাগুলোর মাঝে ইঞ্চি তিন-চারেক করে ফাঁক। আর পাশাপাশি দুটো খাঁচার মধ্যেও একই রকম তক্তার দেওয়াল। খাঁচার দরজাগুলো সব সামনের দিকে। হাঁসকল দিয়ে বাইরে থেকে আটকানো। ঘরের মেঝেতে মাটি-পাথরের ওপর শুকনো ঘাস ছড়ানো। খাঁচার নেকড়েটার দিকে চোখ গেল তাঁর।

নেকড়েটার মুখে রক্ত লেগে রয়েছে !

সবক'টা দাঁত ও মাড়ি বের করে ওটা হিংস্রভাবে গর্জন করছে। আর পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে পাশের খাঁচার কুকুরটার ওপরে। বারবার নেকড়েটা পিছিয়ে আসছে, আর নৃশংস দাঁত-নখ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে দু'-খাঁচার মাঝের দেওয়ালের ওপরে। কাঠের তক্তায় ধাক্কা খেয়ে ওটার শরীরে আঘাত লাগছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই জন্তুটার। তক্তার খোঁচায় লোম ছিঁড়ে পড়ছে, মুখের চামড়া ছড়ে যাচ্ছে।

আর কী বীভৎস গর্জন ! দাঁতের পাশ দিয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়ছে।

অনন্তনারায়ণের শরীরে রক্তপ্রবাহ স্থির হয়ে যেতে চাইল। তাঁর মনে পড়ল গত পূর্ণিমা রাতের কথা, যে-রাতে তিনি নেকড়েটাকে গুলি করে আহত করেছিলেন। সেদিনও জন্তুটা এরকম ভয়ঙ্কর গর্জন করেছিল। কিন্তু আজ তো পূর্ণিমা নয় ! দ্রুতপায়ে জানলার কাছে গেলেন অনন্তনারায়ণ। আকাশের দিকে তাকালেন। আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার। অসংখ্য তারা মিটমিট করছে, কিন্তু চাঁদ কোথাও নেই। আজ অমাবস্যা !

একটা অদ্ভুত স্রোত অনন্তনারায়ণের নাভি থেকে জন্ম নিল। তারপর সিরসির করে সহস্র ধারায় বয়ে বয়ে ছড়িয়ে গেল সারা শরীরে। তাহলে পনেরো দিন অন্তর অন্তর নেকড়েটা এরকম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, পাগল হয়ে ওঠে রক্তের স্বাদের জন্য ?

আবার খাঁচার কাছে ফিরে এলেন। নেকড়েটা একইভাবে গর্জন করছে। ধারালো দাঁতে তক্তা কামড়ে ধরছে। ভেঙে ফেলতে চাইছে। একটা টুকরো পড়েও রয়েছে মাটিতে। এত অমানুষিক শক্তি কোথা থেকে এল একটা নেকড়ের দেহে ?

পাশের খাঁচার কুকুরটার দিকে তাকালেন এবার।

বড় বড় লোমওয়ালা সাদা ও বাদামী ছোপধরা কুকুরটা চাপা স্বরে গর্জন করছে। কোণঠাসা কোনও ভিতু জানোয়ারের চাপা গর্জন। জ্বলজ্বলে সতর্ক চোখে পাশের খাঁচার রক্ত-পাগল শত্রুর দিকে দেখছে কুকুরটা। মাঝে মাঝে সরু মিহি গলায় আর্তনাদও করছে। অন্য দুটো কুকুর চুপচাপ। ভয়ে সিঁটিয়ে রয়েছে দেওয়ালে।

লণ্ঠন উঁচিয়ে ভালো করে নজর চালাতেই নিজের ভুল বুঝতে পারলেন অনন্তনারায়ণ।

তিনি ভেবেছিলেন, কাঠের তক্তায় চোট পেয়ে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হয়েছে নেকড়েটার মুখ। কিন্তু এখন খুঁজে পেলেন আসল কারণ।

পাশের খাঁচার কুকুরটার কোমরের কাছে দুটো গভীর ক্ষত। সেখান থেকে রক্ত পড়ছে। কোনও সুযোগে নেকড়েটা কামড় বসিয়েছে তক্তার ফাঁক দিয়ে। তাহলে কি নেকড়ের লালার বিষ ছড়িয়ে পড়েছে কুকুরটার শরীরে ?

ক্রুদ্ধ গর্জন অনন্তনারায়ণকে পাগল করে দিচ্ছিল। তিনি লণ্ঠন রেখে ফিরে গেলেন শোবার ঘরে। ঘরের এককোণে থাকে তাঁর ওষুধপত্র, রাসায়নিকের সরঞ্জাম। সেখান থেকে একটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ তুলে নিলেন। হাই ডোজের ঘুমের ওষুধ ভরে নিলেন তাতে। তারপর টেবিল-দেরাজ হাতড়ে খুঁজে পেলেন একটুকরো তার। অবশেষে আবার ফিরে চললেন খাঁচার কাছে।

খাঁচা-ঘরের এককোণে কিছু সরু কাঠ ও তক্তা অবহেলায় পড়ে ছিল। নেকড়েটার গর্জনকে উপেক্ষা করে দুটো লম্বা কাঠ তুলে নিলেন অনন্তনারায়ণ। একটার মাথায় সিরিঞ্জটা বাঁধলেন, আর অন্য কাঠের লাঠিটা সিরিঞ্জের পিস্টনের পিছনে রাখলেন, যাতে

ছুঁচ বিঁধিয়ে পিস্টনে চাপ দেওয়া যায়।

নেকড়ের খাঁচার কাছে এসে দাঁড়ালেন। প্রাণীটা হঠাৎই থমকে স্থির হল। লাল লম্বা জিভ বের করে মুখে লেগে থাকা রক্ত চেটে নিতে চেষ্টা করল। তারপর তীক্ষ্ণ সবুজ চোখে অনন্তনারায়ণকে লক্ষ করতে লাগল। যেন জন্তুটা শত্রু অথবা শিকারের মুখোমুখি হয়েছে।

পরমুহূর্তেই নেকড়েটা ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল খাঁচার দরজায়।

অনন্তনারায়ণ শিউরে উঠলেন। সারি সারি ধারালো দাঁত, হিংস্র কুৎসিৎ মুখ আর বাঁকানো নখ তাঁকে মনে পড়িয়ে দিল কিছুক্ষণ আগে দেখা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের কথা। কিন্তু সাহসে বুক বেঁধে তিনি তৈরি হলেন।

জন্তুটা পিছিয়ে গিয়ে দ্বিতীয়বার এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল খাঁচার দরজায়।

তৎপর অনন্তনারায়ণ সঙ্গে সঙ্গে হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ বিঁধিয়ে দিলেন প্রাণীটার গলায়। দ্বিতীয় লাঠিটা দিয়ে পিস্টনে চাপও দিলেন একই সঙ্গে। তারপর এক টান মেরে খালি সিরিঞ্জটা বের করে নিলেন বাইরে।

নেকড়েটা কিন্তু তখনও দমেনি। গর্জন করে একই তেজে ঝাঁপিয়ে পড়ছে খাঁচার দরজায়। কাঠের তক্তায় চিড় ধরছে শব্দ করে।

অনন্তনারায়ণ শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। ঘরে থাকবেন, না চলে যাবেন নিরাপদ দূরত্বে? কিন্তু কোনওরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই দেখলেন, জন্তুটার গর্জন এবং লাফালাফি দুই-ই স্তিমিত হয়ে আসছে।

একটু পরেই ওটা লুটিয়ে পড়ল খাঁচার মধ্যে। এক ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা নেমে এসে গ্রাস করল খাঁচা-ঘরের পরিবেশকে।

একই সঙ্গে অনন্তনারায়ণও যথেষ্ট ক্লান্তি বোধ করছিলেন। সিরিঞ্জটা লাঠির ডগা থেকে খুলে নিয়ে ফিরে চললেন শোবার ঘরে। কাল ডেটল-জলে ডুবিয়ে ওটাকে স্টেরিলাইজ করে নেবেন।

নেকড়েটা ঘুমিয়ে পড়তেই কুকুরগুলো তাদের স্বাভাবিক চলাফেরা শুরু করল খাঁচার ভেতরে। চাপা গলায় ডাক ছাড়ল কয়েকবার। এতক্ষণ ধরে যে-পাশবিক শত্রুতার গন্ধ ওদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় আচ্ছন্ন করে ছিল, সেটা আর টের পাচ্ছে না ওরা। শুধু আহত কুকুরটা মিহি আর্তনাদ করে নিজের ক্ষতস্থান চাটছিল বারবার।

ফায়ার প্লেসের আগুনটা উসকে দিয়ে বিছানায় গা ঢেলে দিলেন অনন্তনারায়ণ। তাঁর উদ্বেগ ও উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে ধীরে ধীরে প্রশান্তি ফিরে আসছিল। পাশ ফিরে সীতাকে কাছে টেনে নিলেন। ওর দেহের আরামদায়ী উষ্ণতায় ভাগ বসাতে চাইলেন। সীতা ঘুম-ঘোরেই ধরা দিল। তবে বিড়বিড় করে কী যেন বলছিল। অনন্তনারায়ণ নাম ধরে বারদুয়েক ডাকতেই ও ঘুম-চোখ মেলে তাকাল। জড়ানো গলায় বলল, 'কী হয়েছিল কুকুরগুলোর?'

'কিচ্ছু না!'

অনন্তনারায়ণ ওকে আরও কাছে টেনে নিলেন। ভালোবাসায় লিপ্ত হলেন। আকস্মিক এই কামনার ঢেউ তাঁকে অবাক করে দিল।

আরও অবাক হলেন, যখন শুনলেন আনন্দের চরম শিখরে পৌঁছে সীতা ফিসফিস স্বরে অস্ফুটভাবে একটি নামই উচ্চারণ করছে, 'মথুর! মথুর!'

গলায় সীতার প্রেমদংশন তিনি গ্রাহ্য করছিলেন না। শুধু ভাবছিলেন, মনোবিজ্ঞানী

হওয়া সত্ত্বেও গত কয়েকদিন ধরে সীতার এলোমেলো আচরণের আসল কারণ যেন উনি
বুঝতে পারেননি। অনন্তনারায়ণের নারী-বিদ্বেষী সত্তা যেন বহুদিন পর ঘুম থেকে উঠে
বসতে চাইল আড়মোড়া ভেঙে।

অনন্তনারায়ণ স্ত্রীকে এতদিন বিশ্বাস করতেন।

সকাল দশটা বাজে, কিন্তু কুয়াশা এখনও কাটেনি।

সীতা মাসার কাছাকাছি অঞ্চলে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মধুর সিংকে
খুঁজছিল। সরু ঢালু পথের দু'পাশে মিলিটারি ব্যারাক। টিনের শেড দেওয়া একই ধাঁচের
খাটো ঘরগুলো। মাঝে মাঝে গাড়ি রাখার জায়গা রয়েছে। কয়েকটা জিপ অথবা ছোট
ট্রাক সেখানে দাঁড়িয়ে। দু'-একজন সামরিক পোশাকের মানুষও চোখে পড়ছে।

সীতা মুখ তুলে আকাশ দেখল, বাতাসের ঘ্রাণ নিল। ফুলগুলোর ঝোপে ভ্রমর ও
প্রজাপতি কখনও কখনও চোখে পড়ছে। রাস্তায় লোক চলাচল কম। চারটে বাচ্চা
ছেলেমেয়ের দল চাদরমুড়ি দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সীতা ও অনন্তনারায়ণ সন্তান চান না।
সেজন্য সীতার কোনও আক্ষেপও নেই। অন্যান্য মেয়ের কাছে মা হওয়ার আকুলতা
শুনে ওর অবাক লাগত। কারণ সেরকম কোনও আকুলতা ও কোনওদিন বোধ করেনি।
মানবিক আবেগ-আকাঙ্ক্ষার বেশিরভাগই ও টের পায় না। দেহটাই যেন ওর সবকিছু।

সামনের পথ ধরে হেঁটে আসা বীরন্দেওকে দেখতে পেল সীতা। কী একরকম পাতা
দিয়ে তৈরি লম্বা লম্বা বিড়ি পাওয়া যায় এখানে। তীব্র কটু গন্ধ তার ধোঁয়ায়। বীরন্দেও
আরাম করে সেই বিড়ি টানছে। আর ওর হাতে একটা ময়লা দড়ি। তার অন্যপ্রান্তে বাঁধা
একটা কালো কুকুর। সেটা কী যেন চিবোচ্ছে।

সীতাকে দেখে বীরন্দেও সেলাম করল। কুকুরটা দেখিয়ে বলল, 'আমার পোষা
জানোয়ার।'

সীতা ছোট্ট করে হাসল। কুকুরটার বিশেষত্ব কিছু নেই। এখানে পথে-ঘাটে যেরকম
বেওয়ারিশ কুকুর পাওয়া যায়, সেইরকমই। নেশাখোর লোকটার যত আজব খেয়াল!
ভাবল সীতা।

বীরন্দেও পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

কুকুরটা অনন্তনারায়ণের জন্য নিয়ে যাচ্ছে না তো বীরন্দেও? যদি নগদ কিছু টাকা
পাওয়া যায়। তখনই সীতার মনে পড়ল গত রাতের কথা। নেকড়েটার পাগল করা
গর্জন বুঝি ওকেও পাগল করে দিচ্ছিল। ওঃ, কী ভয়ঙ্কর!

হঠাৎই মধুর সিংকে দেখা গেল। জিপ চালিয়ে আসছে। একা।

এর মধ্যে বেড়াতে বেরিয়ে আরও তিনবার দেখা হয়েছে মধুরের সঙ্গে। একই সঙ্গে
আলাপ হয়েছে ওর বন্ধু দেবীদয়ালের সঙ্গেও। সব সময় ফুর্তিতে থাকে দেবীদয়াল।
তাছাড়া মধুরের মতো সংযত নয় তার আচরণ।

জিপ কাছে এসে থামল। ঝুঁকে পড়ে আধখানা শরীর বাইরে বের করে দিল মধুর
সিং। হেসে ডাকল, 'উঠে আসুন!'

সীতা মনে মনে তৈরিই ছিল। একই সঙ্গে ওর শরীরের ভেতরে শুরু হয়ে গেছে সেই
দুর্জ্ঞেয় জ্বালা। মধুরের দিক থেকে একটা আকর্ষী গন্ধ যেন ভেসে আসছে ওর নাকে।
ওর কাছাকাছি আসামাত্রই এরকম টান অনুভব করে সীতা। পাগল করা টান।

ও জিপে উঠল। মথুরের পাশে গিয়ে বসল। জিপ চলতে শুরু করল।

মথুরের চুল সামান্য এলোমেলো। মুখ থেকে হুইস্কির গন্ধ বেরোচ্ছে।

'বন্ধুকে যে দেখছি না!' সীতা কিছু একটা বলার জন্যই যেন বলল।

মথুর সিং চোখ ফেরাল রাস্তার দিক থেকে, হাসল : 'আমি তো আছি!'

তারপর বাঁ হাতটা সিটের ওপর দিয়ে এলিয়ে দিল সীতার কাঁধের ওপরে। সীতা ভয় পেল। পরপুরুষের স্পর্শে নয়। বরং ওর শরীরের ভেতরে আনন্দ ও উত্তেজনার যে অবাধ কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে তা মথুর সিং টের পেয়ে যেতে পারে, এই ভেবে।

সীতার ধারণা মিথ্যে নয়। ওর কাঁপুনি মথুর স্পষ্ট টের পেল। এবং বুঝল, সুন্দরী পাখি ওর ফাঁদে ধরা পড়েছে।

উঁচু-নিচু পথে জিপ খুব ঝাঁকুনি দিয়ে চলছিল। ডানদিকে বিস্তৃত ঢেউ-খেলানো সবুজ মাঠ। সেখানে ভেড়া ও ছাগলের পাল চরে বেড়াচ্ছে। কুয়াশা ফিকে হয়ে রোদ জোরালো হয়েছে। দূরের বরফে ঢাকা পাহাড় যেন কত কাছের। মাঠের প্রান্তে বার্চ, পাইন ও দেবদারুর জটলা। সেদিকে তাকিয়ে সীতা অস্ফুটে বলে উঠল, 'কী সুন্দর!'

মথুর বলল, 'এই সুন্দর জায়গায় আপনার বাকি জীবনটা কাটিবে, তাই না?'

সীতা মুখ ফেরাল। একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'তাই তো ভেবেছিলাম, কিন্তু আমার স্বামী যে নেশায় মেতে উঠেছে তাতে...'

মথুরের ভুরু কুঁচকে গেল : 'নেশা! কীসের নেশা?'

'মানুষ-নেকড়ের নেশা!'

'রিয়েলি?' মথুর জিপ থামাল একপাশে। বলল, 'চলুন, নামি। একটু ঘুরে বেড়ানো যাক। আর সেইসঙ্গে নেকড়ের গল্পও শোনা যাবে—'

উলটোদিক থেকে একটা জিপ আসছিল। ওরা নেমে দাঁড়াতেই ওদের পাশ ঘেঁষে গাড়িটা থেমে গেল। জিপের আরোহী তিনজন। তার মধ্যে একজন দেবীদয়াল। মথুরের দিকে তিনজনেই অর্থময় নজরে তাকাল। তারপর দেবীদয়াল সীতাকে উদ্দেশ করে বলল, 'গুড মর্নিং, ম্যাডাম! হ্যাভ আ গুড টাইম!'

ওদের জিপ আবার নড়ে উঠতেই মথুরকে লক্ষ করে চোখ টিপল দেবীদয়াল। তারপর গর্জন তুলে জিপটা বেরিয়ে গেল।

মথুর হেসে সীতাকে পাশে টানল। বলল, 'চলুন, মাঠ পেরিয়ে গাছগুলোর ওদিকে যাই। ওখান থেকে খুব সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। আর যেতে যেতে আপনার বিজ্ঞানী স্বামীর অদ্ভুত নেশার গল্পটাও শোনা যাবে।'

ওরা সবুজ মাঠ ভাঙতে শুরু করল। সীতা বলতে শুরু করল অনন্তনারায়ণের গবেষণার কাহিনী। ঠাণ্ডা বাতাসের বিঁধুনি ওদের দু'জনকে আরও কাছাকাছি এনে দিচ্ছিল।

সব শুনে মথুর বলল, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং। তোমার স্বামীর সঙ্গে আজ রাতে আলাপ করতে যাব।'

সীতা কোনও কথা বলল না।

ওরা দেবদারু, পাইনের জঙ্গলে এসে পড়েছে। এখানে শীত বেশি। চারদিক ধু-ধু নির্জন। মথুর সীতাকে আরও কাছে আঁকড়ে ধরেছে। সীতার শরীরের ভেতরের তোলপাড় বিপজ্জনক জায়গায় পৌঁছে গেছে। ও যেন আর দাঁড়াতে পারছে না। এক্ষুনি যেন হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবে।

ও আচ্ছন্নের মতো প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, সত্যিই কি কোনও মানুষ নেকড়ে হয়ে যেতে পারে ?'

মথুর সিং দুষ্টুমির হাসি হাসল। বলল, 'হ্যাঁ, পারে। যেমন আমি এখন নেকড়ে হয়ে গেছি।'

কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই মথুর সীতাকে জাপটে ধরে চুমু খেল অনেকক্ষণ ধরে। সীতার বুকের ভিতরের গুম-গুম শব্দটা হাজারগুণ বেড়ে গেল মুহূর্তে। শরীর এলিয়ে নিজেকে ও ছেড়ে দিল মথুরের কাছে। ওর শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। তবু অনুভব করতে পারছে ঠোঁটে, গালে, চিবুকে, কপালে মথুর সিংয়ের দস্যু ঠোঁট উন্মত্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাগলের মতো শুরু করে দিয়েছে লুঠপাট, রাহাজানি। আর একইভাবে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে মথুরের শক্তিশালী হাত। কোনও বাধা সে মানছে না। মানার প্রয়োজনও নেই।

এক অদ্ভুত আনন্দে সীতার কান্না পাচ্ছিল। নিজের যৌবনের ওপরে কোনও নিয়ন্ত্রণ আর নেই ওর। সঙ্ঘবদ্ধ অবস্থায় দুটো শরীর লুটিয়ে পড়ল পাইন-দেবদারুর বনে। স্থান-কাল-পাত্র-নীতি-আদর্শ সব ভুলে গেল, সব মিথ্যে হয়ে গেল। শুধু সত্যি হয়ে রইল দুটো দুরন্ত আকাঙ্ক্ষাময় শরীর, শরীরের যৌবন। মথুর আর সীতা, দু'জনেই যেন দুটো নেকড়ে হয়ে গেছে—ক্ষুধার্ত নেকড়ে।

বাতাসে গাছের পাতা দুলছিল। পাতার চিকের আড়াল ভেদ করে তৃণভূমিতে এসে পড়েছে রোদের জাফরিকাটা নকশা। সামনে গভীর খাদ। সেখানে কুলু-কুলু বয়ে চলেছে পাহাড়ী স্রোত। খাদ পেরিয়ে সবুজে ঢাকা পাহাড়। তার চূড়ায় বরফের সাদা টুপি। সূর্যের আলোয় টুপি ঝিলিক মারছে। অসংখ্য সোনালী রেণু যেন ঠিকরে বেরোচ্ছে তার গা থেকে।

ভূমিতলে যুধ্যমান দুটো শরীর এসব সৌন্দর্যের কিছুই দেখছিল না। ওরা পরস্পরকে পরিপূর্ণভাবে আবিষ্কারের চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল।

আর দূরের একটা বার্চ গাছের আড়াল থেকে বীরদেও অখণ্ড মনোযোগে সবকিছু দেখছিল। ওর সঙ্গের কালো কুকুরটাও একইভাবে স্থির নজরে সব দেখছে। মুখে কোনও শব্দ নেই।

একটু পরে বীরদেও কুকুরটাকে দড়ি ধরে টানল।

'চল, কাল্লু ! ফিরতে হবে।'

তারপর নেশাখোর মানুষটা মাঠ ভেঙে এলোমেলো পা ফেলে রওনা দিল। কুকুরটাও অনুগতভাবে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। বীরদেও হেসে তাকে লক্ষ করে বলল, 'বাবু অনেক ইনাম দেবে রে। তখন দু'জনে মিলে পেট-ভর মাল টানা যাবে, কী বলিস !'

কুকুরটা 'ভৌক' শব্দে ছোট্ট করে ডাকল। তখন বীরদেও গলা ছেড়ে ওর প্রিয় দেশোয়ালি গান ধরল। আর কাল্লু অবাক চোখে পিটপিট করে প্রভুকে দেখতে লাগল।

'নেকড়ে-মানুষে আপনি বিশ্বাস করেন ?'

গেলাসের তরলে বড় মাপের চুমুক দিয়ে মথুর সিং অনন্তনারায়ণ বসুরায়কে প্রশ্ন করল।

অনন্তনারায়ণ একটা বেঢপ আরাম কেদারায় গা-ঢেলে বসে ছিলেন। হাতে জ্বলন্ত

সিগারেট। তাঁর অনুসন্ধিৎসু চোখজোড়া মথুর সিংয়ের ওপরে সাপের চোখের মতো স্থির, শীতল তাদের চাহনি। এই লোকটা তাঁর স্ত্রীকে দিনের আলোয় উপভোগ করেছে। বীরদেও নিজের চোখে দেখেছে, আর নিজের কানে শুনেছেন তিনি—গতকাল রাতে। বীরদেওর কাছ থেকে সব শোনার পর ভেবেছিলেন লোকটাকে চিনে নিয়ে যেচেই আলাপ করবেন। তারপর...

কিন্তু তার আর প্রয়োজন পড়েনি। সন্ধেবেলা সীতা নিজেই নিয়ে এসেছে ওর প্রেমাস্পদকে। তারপর আলাপ করিয়ে দিয়েছে স্বামীর সঙ্গে। কী স্পর্ধা!

অনন্তনারায়ণ অন্তরের উত্তেজনা, ঘৃণা ও ধিক্কারকে ভাবে-ভঙ্গিতে অপ্রকাশিত রাখলেন। তিনি মনোবিজ্ঞানী। মানুষের মন বুঝে চলা তাঁর পেশা। আর শুধু মানুষেরই বা কেন, জানোয়ারের মনও কি তিনি পড়ে ফেলতে পারেন না খোলা পাতার মতো?

শীতের দাপট রাতের দিকে অনেক বেড়ে গেছে। তাপমাত্রা বুঝি নেমে গেছে শূন্যেরও নীচে।

ফায়ার প্লেসের আঁচ উসকে দিয়ে গেছে বীরদেও। পশুগুলোকে বরাদ্দ খাবার খেতে দিয়ে চলে গেছে নেশা করতে। আর সীতা এখন রান্নাঘরে। রাতের খাবারের আয়োজন করছে। মথুর সিংকে নৈশভোজ সেরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন অনন্তনারায়ণ। এবং মথুর তা গ্রহণ করেছে সানন্দে।

সীতার মধ্যে নিম্ফোম্যানিয়া বা অতিকাম-এর কিছু কিছু লক্ষণ প্রথম পরিচয়ের পর পরই চোখে পড়েছিল। অনন্তনারায়ণ তখন আমল দেননি। কিন্তু ইদানীং ওর আচার-আচরণ এত বেশি আবেগপ্রবণ বা উদ্বায়ী যে, লক্ষণগুলো বেশ প্রকট হয়ে পড়েছে।

অনন্তনারায়ণ দাঁতে দাঁত চাপলেন। অথচ ঠোঁট টিপে ফুটিয়ে তুললেন হাসির রেখা। জ্বলন্ত সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন। তারপর মদিরার গেলাস তুলে নিয়ে চুমুক দিলেন। বললেন, 'নেকড়ে-মানুষে আমি বিশ্বাস করি, আবার করিও না...'

'তার মানে? ঠিক বুঝতে পারলাম না।' কপালে ভাঁজ ফেলে হাসল মথুর। এক নামজাদা বিজ্ঞানীর স্ত্রীকে জয় করে ও কিছুটা গর্ববোধ করছিল। ওর চোখের উন্নাসিক দৃষ্টি যেন অনন্তনারায়ণকে বলতে চাইছে, আমি তোমার স্ত্রীকে ব্যবহার করেছি।

অনন্তনারায়ণ সে-দৃষ্টির অর্থ পরিষ্কার পড়তে পারছিলেন। তাঁর বুকের ভেতরে একটা ভিসুভিয়াস ছটফট করছিল আকণ্ঠ উত্তপ্ত লাভা নিয়ে। কিন্তু শান্ত স্বরে তিনি বললেন, 'এটা আমি বিশ্বাস করি যে, কোনও কোনও প্রাণীর মধ্যে বিশেষ বিশেষ দিনে—কিংবা রাতে—অস্বাভাবিক হিংস্রতা জন্ম নেয়। তখন তারা হয়ে ওঠে নৃশংস, ভয়ঙ্কর। সেই অবস্থায় প্রাণীটির যা আচরণ, তাকে নেকড়ে-মানুষের আচরণের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তাদেরই বলা যায় ওয়্যারউল্‌ফ বা নেকড়ে-মানুষ। যদিও এর সঙ্গে মানুষের কোনও সম্বন্ধ নেই।'

'এ তো গেল আপনার বিশ্বাস...।' মথুর সিং এক চুমুকে গেলাস খালি করে দিল। খালি গেলাস নামিয়ে রাখল টেবিলে। বলল, 'নেকড়ে-মানুষের কোন ব্যাপারটা আপনি বিশ্বাস করেন না?'

অনন্তনারায়ণ ভারী ওভারকোটটা টেনেটুনে বসলেন। সামনে ঝুঁকে এসে স্পষ্ট জোরালো স্বরে বললেন, 'কোনও মানুষ কখনও নেকড়ে বাঘ হয়ে যেতে পারে—এ আমি বিশ্বাস করি না। যদিও বল্‌কান অঞ্চলের কিংবদন্তী সেরকম কথাই বলে। এক্ষেত্রে

আমার তত্ত্ব হচ্ছে ওই পশুদের মতোই। কোনও কোনও বিশেষ রাতে কোনও মানুষ যদি অমানুষিকভাবে হিংস্র হয়ে ওঠে তাহলে তাকেই আমরা লাইক্যানথ্রোপ বা ওয়্যারউল্ফ বলতে পারি। এইভাবে হিংস্র হয়ে ওঠার পিছনে বেশিরভাগ কারণটাই মানসিক বলে আমার বিশ্বাস। দৈহিক কোনও পরিবর্তন যদিও-বা হয়, তা খুব নগণ্য হবে বলেই আমার ধারণা...'

এমন সময় খাবারের প্লেট নিয়ে সীতা ঘরে ঢুকল।

অনন্তনারায়ণ বুঝতে পারছিলেন, তাঁদের দু'জনের অন্তরঙ্গ আলোচনায় সীতা কীরকম যেন অস্বস্তি বোধ করছে। ওর সুন্দর চোখ বারবারই ছিটকে যাচ্ছে মথুর সিংয়ের দিকে। আর কখনও কখনও সতর্ক চাউনিতে দেখছে স্বামীকে। ঘরের স্তিমিত আলোয় সীতাকে কুণ্ঠিত, ভয়ার্ত দেখাচ্ছিল।

মথুর সহজ গলায় প্রশ্ন করল, 'আপনার ধারণার পিছনে কোনও প্রমাণ আছে?'

'না, এখনও নেই...।' অর্থপূর্ণ চোখে সীতা ও মথুরের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন অনন্তনারায়ণ। তারপর হালকা সুরে বললেন, 'আসুন, এবারে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলা যাক।'

খাবারের প্লেট টেবিলে সাজিয়ে দিল সীতা। নিজেও বসল। ভাত, ডাল, আলুভাজা আর ডিমের ঝাল। বেশ তৃপ্তি করে খেতে লাগল তিনজনে। কথাবার্তা সাধারণ সৌজন্যবোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল। তবে মথুর সিং টেবিলের তলায় পা বাড়িয়ে সীতার পা নিয়ে খেলা করতে লাগল। একবার পায়ে পা লেগে যাওয়ায় অনন্তনারায়ণ সেটা টেরও পেলেন, কিন্তু অকল্পনীয় সংযমে নিজেকে শান্ত ও স্বাভাবিক রাখলেন। কারণ, তাঁর মনের মধ্যে একটা শয়তানী মতলব দানা বাঁধছিল। ক্রমশই পূর্ণাঙ্গ রূপ নিচ্ছিল।

এক অদৃশ্য তরঙ্গের মাধ্যমে সীতা বোধহয় সেটা অনুভব করতে পেরেছিল, কিন্তু ওকে যেন নিশিতে পেয়েছে। মথুরের পাগল-করা আকর্ষণ, নিজের শরীরের কামদগ্ধ জ্বালা, সকালের আহামরি স্মৃতি ওকে বেপরোয়া করে তুলেছে। ও ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে, অথচ একটুও ইচ্ছে করছে না ভেসে উঠতে।

খাওয়াদাওয়া শেষ হল। টেবিল পরিষ্কার করে ফেলল সীতা। অনন্তনারায়ণ ওকে বললেন, 'সীতা, ক্যাপ্টেন সিংয়ের সঙ্গে আমি কিছুক্ষণ গল্প করি। তুমি ইচ্ছে হলে থাকতে পারো—নইলে শুয়েও পড়তে পারো...'

মথুর সিং বলল, 'থাকুক না। তিনজনে গল্প করতে বেশ লাগবে।'

অনন্তনারায়ণ মনে মনে হাসলেন। তারপর হুইস্কির নতুন বোতল, জল ও গেলাস নিয়ে নতুন করে পানের আয়োজন করলেন। সীতা ওদের দেখছিল।

ভোল্টেজ কম থাকায় ঘরের আলো যেন অনেকটা কমে এসেছে। আর খাওয়াদাওয়ার পর শীত বুঝি আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। অনন্তনারায়ণ উঠে গিয়ে ফায়ার প্লেসে আরও কয়েকটা কাঠের টুকরো গুঁজে দিলেন। লাল শিখায় কমলা ভাব ফিরে এল। কাঠ পোড়ার ফট-ফট শব্দ শোনা গেল কিছুক্ষণ। ঘরের মধ্যে একটা মিহি কুয়াশার স্তর যেন ভেসে বেড়াচ্ছে।

অনন্তনারায়ণ ফিরে এসে নিজের জায়গায় গুছিয়ে বসলেন। মথুর একমনে মদে চুমুক দিয়ে চলেছে আর লোভী কামনাভাসি নজরে সীতাকে দেখছে।

'ক্যাপ্টেন সিং, কিছুদিন আগে পূর্ণিমার রাতে আমি একটা দো-আঁশলা প্রাণী ধরেছি। সম্ভবত নেকড়ে আর বুনো কুকুরের মিশ্রণে তৈরি।'

'তাই নাকি ? স্ট্রেঞ্জ !' মথুর সিংয়ের গলার স্বর ক্রমে জড়িয়ে আসছে।

'দো-আঁশলা হলেও ওটার মধ্যে নেকড়ের বৈশিষ্ট্যই বেশি।' হাতের গেলাসে মাপা চুমুক দিলেন বিজ্ঞানী অনন্তনারায়ণ। বললেন, '... আর পনেরোদিন পর পর নেকড়েটা ভয়ঙ্কর হিংস্র হয়ে ওঠে। গতকাল অমাবস্যা ছিল। ওটাকে খাঁচাতে আর ধরে রাখা যাচ্ছিল না...'

মথুরের চিন্তাভাবনা ঘোলাটে হয়ে আসছিল। জিভটা মুখের ভিতরে শক্ত হয়ে গেছে। অথচ ওর সজাগ চোখের নজরে সীতার রূপযৌবন বন্দি।

'আজ নেকড়েটার লালা আর রক্ত মিশিয়ে আমি একটা সিরাম তৈরি করেছি।'

সীতা চমকে উঠল। অনন্তনারায়ণের অদ্ভুত শীতল আচরণ ওর একটুও ভালো লাগছিল না। কখন তিনি সিরাম তৈরি করলেন, কেন তৈরি করলেন, কিছুই বুঝতে পারছে না ও। গলায় উদ্বেগ নিয়ে এই প্রথম মুখ খুলল সীতা।

'সিরাম দিয়ে কী হবে ?'

অনন্তনারায়ণ স্ত্রীর দিকে নজর ফেরালেন : 'কুকুরের ওপরে সিরামের এফেক্ট পরীক্ষা করে দেখব।'

গতকাল রাতে নেকড়েটা পাশের খাঁচার কুকুরের গায়ে কামড় বসিয়েছিল। আজ সকালে খাঁচা-ঘরে গিয়ে অদ্ভুত কতকগুলো জিনিস লক্ষ করেছেন অনন্তনারায়ণ। নেকড়েটা সামান্য ঝিমিয়ে পড়েছে। আর কামড় খাওয়া কুকুরটার মধ্যে কয়েকটা পরিবর্তন এসেছে। চোখে এক উদ্‌ভ্রান্ত হিংস্র দৃষ্টি, ঠোঁট কুঁচকে ধারালো দাঁতের সারি ভয়ঙ্করভাবে বের করে খিঁচিয়ে উঠছে, আর গরগর করে চাপা গর্জন করছে। অন্য দুটো কুকুর যেন সেই রাতের মতোই ভয়ে সিঁটিয়ে রয়েছে।

তাহলে কি নেকড়ের কামড়ে জলাতঙ্ক অথবা ওই জাতীয় কোনও সংক্রামক ব্যাধি ঢুকে গেছে কুকুরটার রক্তে ? সেই কারণেই কি নিরীহ কুকুর হয়ে উঠেছে অমন হিংস্র। অনন্তনারায়ণ আর দেরি করেননি। দুপুরবেলা বীরদেওর সহযোগিতায় হালকা ডোজের ঘুমের ওষুধ ইন্‌জেক্ট করেছেন দুটো পশুরই দেহে। তারপর অতি পরিশ্রম ও কৌশলে সংগ্রহ করেছেন তাদের রক্ত এবং লালা। গভীর মনোযোগে তৈরি করেছেন সিরাম। সেই সিরাম অল্প পরিমাণে ইন্‌জেক্ট করেছেন অন্য একটা সুস্থ কুকুরের দেহে। রোজই নিয়মিতভাবে সুস্থ প্রাণীটার শরীরে সিরাম ইন্‌জেক্ট করবেন তিনি। তারপর পনেরোদিন পরে দেখবেন পরীক্ষার ফলাফল। দেখবেন, কুকুরটার আচার-আচরণে উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন হয় কিনা।

মথুর সিং ভারী গলায় কৌতূহল দেখাল, বলল, 'আপনার কি মনে হয় কুকুরের ওপর সিরামের কোনও এফেক্ট পাওয়া যাবে ?'

হাসলেন অনন্তনারায়ণ। বললেন, 'জানি না। একমাত্র পরীক্ষার ফলাফল দেখেই সেটা বলা সম্ভব।'

রাত ক্রমশ বাড়ছে। হঠাৎই সীতা বলে উঠল, 'ক্যাপ্টেন সিং, আপনি ক্যাম্পে ফিরবেন না ? রাত হয়ে যাচ্ছে...'

'হ্যাঁ, উঠব।' মথুর উঠে দাঁড়াতে গেল। ওর শরীর টলে উঠল। সীতা ধরে ফেলল ওকে।

অনন্তনারায়ণ সীতার দিকে দেখলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সীতা, তুমি এখন যেতে পার। আমি ক্যাপ্টেন সিংকে জিপে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি।'

কথাগুলো নরম স্বরে বললেও তার মধ্যে কঠিন আদেশের সুর ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ছিল। নীতা স্বামীর ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকাল। মথুরকে একবার দেখল। তারপর বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। কিন্তু ঘরের কথাবার্তা শোনার জন্য ওর মন ছটফট করতে লাগল।

নীতা চলে যেতেই মথুরকে ধরে চেয়ারে বসালেন অনন্তনারায়ণ। হুইস্কির বোতল শেষ। মথুর সিংয়ের গেলাসও নিঃশেষিত। শুধু অনন্তনারায়ণের গেলাসে এখন চুমুক দুয়েক সুরা অবশিষ্ট রয়ে গেছে।

'ক্যাপ্টেন সিং!' ঝুঁকে পড়ে জোরালো তীক্ষ্ণ গলায় ডাকলেন তিনি। 'যাওয়ার আগে জানোয়ারগুলোকে একবার দেখবেন না?'

'আলবাৎ দেখব!' টেবিলে চাপড় মেরে বলে উঠল মথুর, 'আমি ওসব ফালতু ফেয়ারি টেল বিশ্বাস করি না। এতদিন মানায় রয়েছি, আশপাশে নেকড়ে আছে বলে কখনও শুনিনি। লেট মি সি ফর মাইসেল্ফ।'

মথুর উঠতে যাচ্ছিল, অনন্তনারায়ণ ওকে ধরে আবার বসালেন। বললেন, 'আমি তাহলে একবার দেখে আসি, খাঁচার দরজাগুলো ঠিকঠাক বন্ধ আছে কিনা। বীরদেওটা যে নেশার ঘোরে কী কাজ করে, কোনও বিশ্বাস নেই।'

মথুর সিংয়ের চোখে জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল। কিন্তু আর কোনও ব্যাখ্যা না করে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন অনন্তনারায়ণ।

একটু পরেই ফিরে এলেন। বললেন, 'চলুন।'

ওঁরা দু'জনে রওনা হলেন।

খাঁচা-ঘরে ঢুকতেই একটা বোঁটকা গন্ধ নাকে এসে ধাক্কা মারল। তার সঙ্গে মিশে রয়েছে কাঁচা মাংসের আঁশটে দুর্গন্ধ। লণ্ঠনের আলোয় পা ফেলে মথুর সিং এগিয়ে গেল, কিন্তু অনন্তনারায়ণ সতর্ক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলেন দরজার কাছাকাছি।

চাপা ক্রুদ্ধ গর্জন কানে এল। নতুন মানুষকে দেখে জন্তুগুলো মোটেও খুশি হয়নি। কিন্তু মথুর তাদের খুশি-অখুশিকে একটুও পাত্তা না দিয়ে বেসামাল পায়ে এগিয়ে গেল খাঁচাগুলোর খুব কাছে। জড়ানো স্বরে তু-তু বলে ডাকল, টাগরায় জিভ ঠেকিয়ে চুক-চুক শব্দ করল। তাতে প্রাণীগুলোর কোনওরকম প্রতিক্রিয়া না দেখে মুখ ফেরাল অনন্তনারায়ণের দিকে।

'কী হল, সায়েন্টিস্ট সাহেব, এই আপনার ফেরোসাস ওয়্যারউল্ফ?'—তারপর মথুর গলা ছেড়ে হেসে উঠল হা-হা করে।

দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল তখনই।

একটা বিকট ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল। তারপরই নেকড়েটা স্প্রিংয়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল খাঁচার দরজায়। এক ঝটকায় খাঁচার দরজা খুলে গেল—হয়তো হাঁসকল খোলা ছিল ভুলবশত। এবং একটা ঘোর বাদামী ছায়া গোখরো সাপের তৎপরতায় ছোবল বসাল মথুর সিংয়ের কোমরে।

অনন্তনারায়ণ চিৎকার করে উঠলেন, 'সাবধান, ক্যাপ্টেন সিং!'

আর মথুর ছিটকে পড়ল পাথুরে মেঝেতে। একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল ওর গলা থেকে। ক্ষুধার্ত নেকড়েটা ভয়ঙ্কর ঝকঝকে দাঁতের সারি বের করে মথুরের গলায় কামড় বসাতে গেল।

খাঁচার কুকুর তিনটের মধ্যে দুটো কৌতূহলী হয়ে দেখছে, আর তৃতীয়টা লকলকে জিভ

দিয়ে ঠোঁট চাটছে, হিংস্র গর্জন করছে।

মথুর ওর কোট পরা বাঁ হাত এগিয়ে দিল দু'পাটি ধারালো দাঁতের সামনে। ধস্তাধস্তি চলছে। নেকড়েটার ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ও পেরে উঠছে না। কোটের কাপড় ভেদ করে তীক্ষ্ণ দাঁত বসে গেল হাতে। মথুরের সারা শরীর কনকন করে উঠল যন্ত্রণায়। ওর মাথার মধ্যে যেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটে গেল মুহূর্তে। এক ভয়ঙ্কর তীব্র চিৎকার করে মথুর সিংয়ের ডান হাত ওর ওভারকোটের পকেট হাতড়াতে লাগল পাগলের মতো।

অনন্তনারায়ণ কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন স্থবির হয়ে গিয়েছিলেন। মথুরের বুক-ফাটা চিৎকারে সংবিৎ ফিরে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন শোবার ঘর লক্ষ করে। নাইন মিলিমিটার অটোমেটিকটা তাঁর চাই।

কিন্তু শোবার ঘরে ঢুকবার মুখেই সীতার সঙ্গে ধাক্কা লাগল তাঁর। ও ছুটে বেরিয়ে আসছিল ঘর থেকে। পলকের জন্য স্বামী-স্ত্রীর চোখাচোখি হল। সীতার চোখে কুটিল সন্দেহ। অনন্তনারায়ণ সেসব গ্রাহ্য না করে পাশ কাটিয়ে দ্রুত ঢুকে গেলেন ঘরে। টেবিলের ড্রয়ার থেকে রিভলভারটা বের করে নিয়ে ফিরে আসতে যাবেন, একটা রক্ত-হিম চিৎকারে থমকে দাঁড়ালেন।

পরক্ষণেই গুলির শব্দ।

ক্রুদ্ধ গর্জন, মানুষের কাতরানি—সবকিছু যেন মিলেমিশে জট পাকিয়ে যাচ্ছে। অনন্তনারায়ণ খাঁচা-ঘর লক্ষ করে ছুটলেন। সঙ্গে হতভম্ব বিমূঢ় পাগলপারা সীতা।

অবাক হয়ে তিনি লক্ষ করলেন, লাজ-লজ্জা-আশঙ্কা সব ত্যাগ করে সীতা মথুরের নাম ধরে কান্নাভাঙা গলায় চিৎকার করে ডাকছে।

মথুর সিংয়ের ডান হাতে ধরা ০·৩৮ মিলিটারি স্পেশাল পিস্তল থেকে তখনও ধোঁয়ার সরু আঁকাবাঁকা রেখা বেরিয়ে আসছে। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত। বাঁ হাত ও কোমর রক্তাক্ত। ডান হাতের কনুইয়ের ওপরে শরীরের ভর রেখে আধশোয়া অবস্থায় স্থির হয়ে আছে। মাথাটা পিছন দিকে হেলানো। চোখ ঘরের ছাদের দিকে। হাঁ করে বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে যন্ত্রণার গোঙানি।

খাঁচার দরজা যেমন খোলা ছিল তেমনই হাট করে খোলা। হিংস্র নেকড়েটা ঘরের ত্রিসীমানায় নেই। কুকুরগুলো নিশ্চুপ।

সীতা কেঁদে উঠে ছুটে গেল মথুরের কাছে। মাথাটা কোলে তুলে নিল। স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'শিগ্‌গির কিছু একটা করো!'

অনন্তনারায়ণ ইতিউতি চাইছিলেন। বোধহয় নেকড়েটার হদিস করতে। সেটা লক্ষ করে মথুর সিং দাঁতে-দাঁত চেপে কোনওরকমে বলল, 'জানোয়ারটা পালিয়েছে...'

তখন অনন্তনারায়ণ ঝটিতি এগিয়ে গেলেন মথুরের কাছে। সীতার সহযোগিতায় ওকে তুলে নিলেন মেঝে থেকে। তারপর বললেন, 'শোবার ঘরে নিয়ে চলো।'

অসুস্থ গন্ধময় পরিবেশ থেকে ওঁরা বাইরে এলেন। হিমঠাণ্ডায় শরীর জমে যেতে চাইছে। দূরের পর্বতচূড়া ফ্যাকাসেভাবে চোখে পড়ছে। কুয়াশা আজ রাতে কিছুটা কম। সেই কারণেই হয়তো শীতের কামড় বেড়েছে। আঁধারি মাঠ, ঘন কালো গাছের ছায়া-শরীর, বুনো ঝোপ, সবদিকে নজর বুলিয়ে নিলেন অনন্তনারায়ণ। কোথায় গিয়ে লুকিয়েছে নেকড়েটা? জন্তুটা কি মথুরের গুলিতে আঘাত পেয়েছে, আহত হয়েছে?

বাড়িতে ঢুকে পড়লেন ওঁরা তিনজন। মথুরের গোঙানি থামেনি। তাড়াতাড়ি ওকে নিয়ে যাওয়া হল শোবার ঘরে। শুইয়ে দেওয়া হল বিছানায়। অনন্তনারায়ণ প্রাথমিক

চিকিৎসায় মেতে উঠলেন অস্বাভাবিক ব্যস্ততায়। সীতা উৎকণ্ঠিতভাবে সহযোগিতা করতে লাগল। গরম জল, তুলো, ব্যান্ডেজ, ওষুধ। গত পূর্ণিমার রাতে আহত নেকড়েটার কথা মনে পড়ছিল বারবার।

'ওটার গায়ে গুলি লেগেছে?' মথুরের কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রশ্ন করলেন অনন্তনারায়ণ।

'জানি না, বলতে পারি না।' যন্ত্রণাকাতর স্বরে থেমে থেমে বলল ক্যাপ্টেন মথুর সিং। 'তবে গুলির আওয়াজেই জানোয়ারটা আমাকে ছেড়ে পালাল। নইলে আমার গলার নলি ছিঁড়ে নিত...'

অনন্তনারায়ণ সীতাকে মথুরের কাছে রেখে সরে গেলেন। একটু পরেই একটা সিরিঞ্জে অনেকটা সিরাম ভরে নিয়ে এলেন। মথুরের ডান বাহুতে ছুঁচ ফুটিয়ে পুরো সিরামটাই ঢুকিয়ে দিলেন ওর শরীরে। মথুর সিংয়ের মুখ আরও বিকৃত হল যন্ত্রণায়।

সীতা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। ইঞ্জেকশানটা দিতেই চেরা গলায় জিগ্যেস করল, 'কীসের ইঞ্জেকশান দিলে?'

অনন্তনারায়ণ স্মিত হাসলেন। বললেন, 'ভয় নেই। ঘুমের ওষুধ। ক্যাপ্টেন সিংয়ের এখন রেস্ট দরকার।'

মথুর সিং অনন্তনারায়ণকে উদ্দেশ করে বলল, 'আমার জিপে রামের বোতল আছে। একটু এনে দেবেন? ভীষণ কষ্ট হচ্ছে...'

বিনা বাক্যব্যয়ে অনন্তনারায়ণ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে পাশে দাঁড়ানো সীতাকে ডান হাতে কাছে টেনে নিয়ে চুমু খেল মথুর।

'তোমার কিছু হয়নি তো?' সীতা জিগ্যেস করল।

'কিছু না, ডার্লিং, কিছু না!' মথুর সিং ক্লিষ্ট হাসল : 'মিলিটারি আদমির জান বহুত কড়া হয়।'

সীতা ওর কপালে হাত বুলিয়ে দিল। ওর শরীরে সেই পুরনো জ্বালাটা এখন ফিরে এসেছে আবার। নিজেকে ও যেন আর ধরে রাখতে পারছে না। ঠোঁট কাঁপছে, বুক কাঁপছে, শরীর কাঁপছে...।

এমন সময় অনন্তনারায়ণ দুটো বোতল হাতে ফিরে এলেন। একটা খুলে মথুরের হাতে দিলেন। আর অন্যটা দেখিয়ে বললেন, 'এটা আমার জন্যে এনেছি—ইফ য়ু ডোন্ট মাইন্ড...'

মথুর এক ঢোক রাম গিলে ফেলল। তারপর মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে বলল, 'মাইন্ড মাই ফুট। লাগলে আরও দু'-বোতল গাড়িতে আছে।'

অনন্তনারায়ণ হেসে মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ, তিনি সেটা দেখেছেন। তারপর ওর ব্যান্ডেজগুলো ঠিকমতো পরীক্ষা করে সীতাকে বললেন, 'সীতা, ওঁর দিকে খেয়াল রেখো। আমি বসবার ঘরে যাচ্ছি। আজ আমার আর ঘুম আসবে না। সব ওলটপালট হয়ে গেছে...।'

শ্লথ পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন অনন্তনারায়ণ।

ঠিক তক্ষুনি বহুদূর থেকে ভেসে এল একটা ক্রুদ্ধ টানা গর্জন। হিমেল বাতাসে কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে গেল সেই জ্বালাময়ী জান্তব চিৎকার।

'ওই নেকড়েটা!' সীতা ভয়ার্ত স্বরে বলল।

'এখন তুমি শুধু এই নেকড়েটার দিকে মনোযোগ দাও।' বলে মথুর সিং আবার ওকে

চুমু খেল। তারপর ডান হাতেই ওকে যথেচ্ছ আদর করতে শুরু করল।

সীতা সরে আসার চেষ্টা করছিল, কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছিল ওর হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছে। স্বামীকে ও আর একটুও ভয় পাচ্ছে না। এমনকি কোনও সঙ্কোচ বোধও ওর মধ্যে নেই। মথুরকে নাগালের মধ্যে পেয়ে ও বড় নগ্নভাবে নির্লজ্জ হয়ে পড়ছে।

অন্ধকার রাত তখন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছে গভীরতর রাতের দিকে।

এক সময় ভোরের আলো ফুটল।

এখানে ভোর হয় কুয়াশার আলপনা এঁকে। তারই পরদা সরিয়ে দেখা যায় গাঁয়ের রাখালরা ভেড়া-ছাগলের পাল নিয়ে চলেছে মাঠে চরাতে। সূর্যের তেজ একটু বেড়ে উঠলে মেয়েরা বেরিয়ে পড়ে গম, বার্লি, আলুর খেতে কাজ করতে। শুরু হয় মিলিটারি জিপের চলাচল। কোনও কোনও ভ্রমণকারী দল বদ্রীনাথ থেকে তিন কিলোমিটার চড়াই ভেঙে চলে আসে মানা গ্রামের রূপ দেখতে, কেউ যায় বসুধারা জলপ্রপাত দেখতে, আর অধিক দুঃসাহসী কেউ কেউ চলে যায় অলকানন্দার উৎসমুখ ভগীরথ খরাক ও সতোপন্থ গ্লেসিয়ার দুটো দেখতে।

বসবার ঘরের জানলায় বসে অনন্তনারায়ণ বসুরায় সকালের কনকনে ঠাণ্ডা অনুভব করছিলেন।

সারাটা রাত জেগে কাটিয়েছেন তিনি। রামের বোতল কখন খালি হয়ে গেছে হুঁশ নেই। আচ্ছন্ন মস্তিষ্কে একের পর এক উদ্ভট অমানুষিক ভয়ঙ্কর সব চিন্তা এসে ভিড় করেছে। তারই মাঝে মাঝে আবছাভাবে শুনতে পেয়েছেন মানুষের রক্তের স্বাদ পাওয়া পলাতক নেকড়েটার বুকফাটা হিংস্র চিৎকার। যতবার সে-চিৎকার শুনেছেন ততবারই এক তুরীয় উল্লাসের তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছে দেহে ও মনে। তাঁর গবেষণা কি সফল হবে তাহলে ? এতদিন ধরে যে-ধারণা ও বিশ্বাস তিনি সযত্নে লালনপালন করে এসেছেন, পাওয়া যাবে কি তার জ্বলন্ত প্রমাণ ?

মথুর সিংয়ের কথা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রামের গন্ধ মেশা বিস্বাদ একদলা থুতু উঠে এল গলায়, মুখে। মথুর সিং ! বাস্টার্ড ! এই যে কিছুদিন ধরে ভয়ঙ্কর হিংস্র হয়ে উঠেছেন তিনি, একে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে কোন পথে ব্যাখ্যা করা যায় ? বরাবর তিনি নারীবিদ্বেষী ছিলেন সন্দেহ নেই। হঠাৎই শেষ যৌবনে সীতা এসে হাজির হয়েছে ভালোবাসা নিয়ে। তাঁর জীবনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দ্রুত হাতে কড়া নেড়েছে অধৈর্যভাবে বারবার। অনন্তনারায়ণ সে-ডাকে সাড়া দিয়েছেন। কেন ? বিশ্লেষণ করে দেখলে তার কারণ হয়তো একটাই : অনন্তনারায়ণ নারীসঙ্গ চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন তাঁর অটুট কৌমার্য কেউ আইন মোতাবেক হরণ করুক। সহজ কথায়, কাম উত্তেজনার একটা অনর্গল বাহির-পথ তাঁর প্রয়োজন ছিল।

সীতার চিকিৎসার সময়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ওর মধ্যে অতিকামের লক্ষণ রয়েছে। কিন্তু তাতে সাবধান না হয়ে পুলক বোধ করেছেন অনন্তনারায়ণ। মনের আনন্দে বিবাহিত জীবনের স্বাদ পুরোমাত্রায় উপভোগ করছিলেন, এমন সময় কালো মেঘ দেখা দিল। মথুর সিং ! একটা ভয়ঙ্কর নেকড়ে !

প্রথমে একটা মানসিক ধাক্কা খেয়েছিলেন অনন্তনারায়ণ। কিন্তু পরক্ষণেই একটা বিকৃত উল্লাস তাঁর মনে ঝিলিক মেরেছিল। যে-গবেষণা তিনি শুধুমাত্র পশুতে সীমাবদ্ধ

রাখবেন বলে ভেবেছিলেন, তাকে কি বিস্তৃত করা যায় না মানুষ পর্যন্ত ? তাঁর এতদিনকার ধারণা ও বিশ্বাসের প্রমাণ খুঁজে দেখা যায় না কি ?

অনন্তনারায়ণের ক্রোধের আঁচে জ্ঞানপিপাসা ও ঘৃণা একসঙ্গে টগবগ করে ফুটেছে। তৈরি হয়েছে এক বিচিত্র দ্রবণ। যার অপর নাম সিরাম। রোগগ্রস্ত পাগল নেকড়ে ও কুকুরের রক্ত আর লালা দিয়ে তৈরি সিরাম। যে-সিরাম তিনি ঘুমের ওষুধের নাম করে ইনজেক্ট করেছেন মথুর সিংয়ের দেহে।

খাঁচার দরজা তিনিই খুলে এসেছিলেন অতি সন্তর্পণে। ফলে তাঁর আশা অনুযায়ী মথুর সিং পাগল নেকড়ের কামড় খেয়েছে। জন্তুটার লালা থেকে অসুখের বীজ রোপিত হয়ে গেছে মথুরের রক্তে। তার ওপর পড়েছে হাই ডোজের সিরাম।

এখন, এই মুহূর্তে, মথুরের সঙ্গে সীতার সম্পর্ক নিয়ে আর বিন্দুমাত্রও চিন্তিত নন তিনি। যত খুশি, যতবার খুশি, ওরা দু'জনে লিপ্ত হোক পরস্পরে। যৌবনের চেয়ে বিজ্ঞান অনন্তনারায়ণ বসুরায়ের কাছে অনেক বেশি দামি, হয়তো অমূল্য। তাঁর লক্ষ্য এখন শুধু একটাই : নিয়মিতভাবে মথুর সিংয়ের দেহে সিরাম ইনজেক্ট করা। এর জন্য মথুর সিংকে দু'দিন অন্তর অন্তর নিয়ে আসতে হবে বাড়িতে। সীতাকে রাজি করাতে হবে। ও রাজি হবে। কারণ, মথুর সিং এলে নিজের শোবার ঘর ওদের জন্য ছেড়ে দেবেন তিনি। ফলে অতিকামী রমণী অমোঘ আকর্ষণে প্রিয় পুরুষকে কাছে টানবেই। তারপর নিয়মিত সিরাম প্রয়োগ এবং তার ফলাফল। অনন্তনারায়ণ ক্রূর হাসলেন। একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য ভেসে উঠল তাঁর চোখের সামনে।

পূর্ণিমার রাত। পাথুরে রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছে একটি মানুষ। কিছুদিন আগেই ক্ষিপ্ত নেকড়ের কামড় খেয়েছে মানুষটি। নরম জ্যোৎস্নায় পথ চলতে চলতে সে থমকে দাঁড়াল। শরীরের ভেতরে শুরু হয়েছে বেসামাল কাঁপুনি, দুরন্ত ছটফটানি। মাথা পিছনে হেলিয়ে পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকাল। সাদা আলো ছড়িয়ে পড়ল মুখে। শিউরে উঠল। কপালে ভাঁজ পড়ল। এ কোন অসুখ দখল করেছে শরীর ! চাঁদের দিক থেকে কিছুতেই নজর সরাতে পারছে না। ঝুলে থাকা রুপোর থালাটা যেন সম্মোহিত করে ফেলেছে, বিপজ্জনক দিকে ঠেলে দিতে চাইছে, হুকুম করছে নীরবে। পাথুরে জমিতে জন্তুর মতো চার হাত-পায়ে ঝুঁকে পড়ল। মুখ তখনও ওপরে তোলা, চাঁদের দিকে। জড়িয়ে যাওয়া স্বরনালী দিয়ে অদ্ভুত শব্দ বেরিয়ে আসছে। দাঁতগুলো যেন কেমন ঠেকছে, মুখের ভেতরে এঁটে উঠছে না। হাতের আঙুলগুলো কেমন বেঁকে গেছে অস্বাভাবিকভাবে, নখগুলো মাপে অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু মনটা এখনও মানুষের মতো। ধীরে ধীরে বুঝতে পারল কী হচ্ছে, কোন অভিশাপ নেমে এসেছে শরীর ও মনের ওপরে। এই মুহূর্তে সে মানুষ নয়, নেকড়েও নয়, মাঝামাঝি কিছু। যুক্তি-বুদ্ধি সব জট পাকিয়ে ফেটে পড়ছে জ্বালা, ক্রোধ আর হিংসা।

তারপর সে হিংস্র গর্জন করে উঠল।

এমন সময় রাতের পথে এগিয়ে এল একটি সুস্থ মানুষ। নিশ্চিন্তে পথ হাঁটছে। আর অদ্ভুত অ-মানুষটা গা-ঢাকা দিয়ে ওত পেতে আছে শিকারের কাছে আসার অপেক্ষায়। তারপর...

তারপর একটা কিংবদন্তী জন্ম নেবে।

বলকান প্রদেশের মতো উত্তরপ্রদেশেও মানুষরা বিশ্বাস করবে সেই কিংবদন্তীতে।

এ স্বপ্ন কি সত্যি হবে ? ভাবলেন অনন্তনারায়ণ। পালিয়ে যাওয়া নেকড়েটার জন্য

তাঁর আক্ষেপ হচ্ছিল। যদি কোনওভাবে ওটা ফিরে পাওয়া যেত, তাহলে...

'ক্যাপ্টেন সিংয়ের ঘুম ভেঙেছে!'

চমকে উঠে ফিরে তাকালেন অনন্তনারায়ণ। দরজায় দাঁড়িয়ে সীতা। বেশবাস শতকরা একশো ভাগ সংযত নয়। তিনি বুঝলেন স্পষ্ট। আহত অসুস্থ মথুরকেও রেহাই দেয়নি সীতা। কিন্তু এভাবে কতদিন? যদি তাঁর স্বপ্ন সত্যি হয়...

অনন্তনারায়ণ জানলার কাছ ছেড়ে উঠে এলেন। বললেন, 'চলো—'

শোবার ঘরে এসে দেখলেন পোশাক-আশাক পরে তৈরি হয়ে মথুর সিং বিছানায় বসে আছে। মুখে ক্লান্ত হাসি। তাঁকে দেখেই উচ্ছল গলায় বলে উঠল, 'থ্যাঙ্ক য়ু, ডক্টর। এই তো, দিব্যি আমি বেঁচে আছি। যাকো রাখো সাঁইয়া মার সকে না কোই...'

অনন্তনারায়ণ কৃত্রিম হাসলেন। তিনি শুধু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মথুরকে দেখতে লাগলেন। এত তাড়াতাড়ি কি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাবে? বোধ হয় না।

'গতরাতের অ্যাক্সিডেন্টের জন্যে আমি দুঃখিত, ক্যাপ্টেন সিং। ক্ষমা চাইছি।' অনন্তনারায়ণ বললেন, 'আসলে যে-লোকটি খাঁচাগুলো দেখাশোনা করে, সে একটি পাঁড় মাতাল। তাছাড়া কাল যখন আমি খাঁচাগুলো দেখতে যাই, তখন ওই খাঁচার দরজাটা যে খোলা সেটা অল্প আলোয় নজরে পড়েনি। আই অ্যাম রিয়েলি সরি!'

মথুর সিং সৌজন্যের হাসি হাসল।

'সবই কপাল, বুঝলেন ডক্টর।' মথুর সীতার দিকে অর্থপূর্ণ চোখে তাকাল। মনে মনে অনন্তনারায়ণকে অল্পবিস্তর সন্দেহ করলেও সীতার দিকে তাকিয়ে সব অপরাধই ও ক্ষমা করে দিয়েছে। গতরাতের দুর্ঘটনার ভয়ঙ্কর স্মৃতিকে মুছে দিয়েছে সীতার যৌবন নিয়ে খেলার মনোরম স্মৃতি।

মথুর সিং লোভাতুর চোখে সীতার দিকে তাকিয়ে রইল। বুড়ো ডাক্তারটা আপনমনে কী বলে চলেছে, কিছুই তার মগজে ঢুকছিল না। শেষে ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার কথা উঠতেই মথুর সিং অনন্তনারায়ণকে বলল, 'কিন্তু ডক্টর, আমার চিকিৎসার কী হবে? ব্যারাকে ডাক্তার আছে বটে, তবে...'

অনন্তনারায়ণ মনে মনে হাসলেন। মূর্খটা কামনাবাসনায় পাগল হয়ে গেছে। এখানে এসে চিকিৎসার অছিলায় সীতাকে কাছে পেতে চাইছে। অথচ তিনিই চিন্তিত ছিলেন কীভাবে ওকে দু'দিন অন্তর বাড়িতে নিয়ে আসবেন। যাক, সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে মথুর সিং নিজেই।

অনন্তনারায়ণ বললেন, 'এমনিতে ভয়ের কিছু নেই। শুধু দু'-দিন অন্তর এসে আপনাকে একটা ইঞ্জেকশান নিয়ে যেতে হবে। আর জন্তু-জানোয়ার নিয়ে সামান্য চর্চা তো করেছি, সুতরাং বিশ্বাস রাখতে পারেন আমার ওপরে—'

'শুধু বিশ্বাস? আমি এখন স্রেফ আপনাদের হাতে—' বলে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মথুর সিং। সঙ্গে সঙ্গে সীতা ওকে ধরে ফেলল। মথুর নির্লজ্জের মতো ভর রাখল সীতার কাঁধে। অনন্তনারায়ণ সাহায্যের জন্য এগোলেন না। তিনি চাইছিলেন, যাওয়ার সময়ও সীতার নেশা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকুক মথুর সিংকে। বললেন, 'পরশুদিন মনে করে আসবেন কিন্তু—'

সীতা বোধ হয় ব্রেকফাস্ট সেরে যাওয়ার কথা বলেছিল, তাতে মথুর বলেছে, সারারাত ক্যাম্পে ফেরেনি, জলদি ফেরা দরকার। আর একদিন এসে খাওয়াদাওয়া করা যাবে। বলে সে হেসেছে।

অনন্তনারায়ণ আর দাঁড়াননি। বসবার ঘরে ফিরে গেছেন। নির্দিষ্ট খাতা নামিয়ে লাইক্যানথ্রপি-সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে লিখতে শুরু করেছেন।

লেখা শেষ হলে নতুন সিরাম তৈরি করতে হবে। কামড় খাওয়া কুকুরটাকে আর সুস্থ একটি কুকুরকে নিয়মমতো সিরাম ইনজেক্ট করতে হবে।

বই-খাতাপত্র ছড়িয়ে ডুবে গেলেন অনন্তনারায়ণ বসুরায়। একটানা চার ঘণ্টা মানুষ-নেকড়ে নিয়ে একেবারে মেতে গেলেন তিনি।

যখন সচেতন হলেন তখন সীতার রেখে যাওয়া ব্রেকফাস্ট জুড়িয়ে বরফ হয়ে গেছে।

'মধুরকে নিয়ে দিনের পর দিন তুমি কী ছিনিমিনি খেলছ?' রাতের শীত ও অন্ধকার চিরে প্রশ্নটা যেন ছিটকে এল।

অনন্তনারায়ণ বসবার ঘরে টেবিলে বই-কাগজপত্র ছড়িয়ে বসে ছিলেন। গবেষণার বিভিন্ন রিপোর্ট খতিয়ে বের করার চেষ্টা করছিলেন মানুষ ও নেকড়ের সেতুবন্ধনের গূঢ় সূত্র। হাতে কলম। মাথার চুল অবিন্যস্ত। চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ। ভোল্টেজ কম থাকায় বাল্বের ম্লান আলোয় সে-ক্লান্তি যেন শতগুণ করুণ হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রশ্নটা শুনে অনন্তনারায়ণের পিঠে যেন চাবুক পড়ল। ঝুঁকে বসে ছিলেন। চকিতে শিরদাঁড়া সোজা করলেন। মুখ ঘুরিয়ে স্ত্রীকে দেখলেন।

কান্নার শ্লেষের আগুনের আঁচে ফরসা মুখ আরও টকটকে। তেজী যৌবনের ছলনাময় ভাঁজ-খন্দ আরও প্রকট, আরও লোভনীয়। গলার স্বরে প্রকাশ্য প্রতিবাদ এবং বিদ্রোহ। এরকমটা আগে কখনও হয়নি। একটা দেহবাদী শ্বেতকেউটে যেন আচমকা ফুঁসে দাঁড়িয়েছে।

আগামীকাল পূর্ণিমা। মধুরের দেহে শেষ ইঞ্জেকশান দেওয়ার দিন। ওর আচরণে এমনিতে কোনও পরিবর্তন চোখে পড়েনি। তবে অনন্তনারায়ণের সঙ্গে ওর দেখাসাক্ষাৎ হয় খুবই কম সময়ের জন্য। বেশিরভাগ সময়টাই অধিকার করে থাকে সীতা। সুতরাং পরিবর্তনের লক্ষণ যদি সবার আগে কারও চোখে ধরা দেয়, সে সীতা। সেরকম কোনও পরিবর্তন কি চোখে পড়েছে ওর?

মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে সহজ গলায় বলে ওঠেন অনন্তনারায়ণ. 'কী ছিনিমিনি খেলছি?'

'যে ইঞ্জেকশান তুমি ওকে দাও, সেগুলো কিসের ইঞ্জেকশান?'

অনন্তনারায়ণ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, সীতা দ্রুত কাছে এগিয়ে এসে তাঁকে বাধা দিল। বলল, 'ঘুমের ইঞ্জেকশান বলে তুমি আর আমাকে বোকা বানাতে পারবে না।'

হাসলেন অনন্তনারায়ণ। সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'বোসো।'

সীতা বসল।

'দেখো সীতা, তুমি যতখানি বোকা, তার চেয়ে. বেশি বোকা তোমাকে আর কেউ বানাতে পারবে না—আমিও না।'

সীতার মুখ-চোখ আরও রক্তাভ হল। চোখের পাতা পড়ল ঘন-ঘন।

'তবে এটুকু জেনে রাখো, এই বয়েসে এসে তোমার কাছে ডাক্তারি শেখার ইচ্ছে আমার নেই। আর মধুর সিংয়ের ভালোমন্দ তাকে নিজেকেই বুঝতে দাও। ওর কাছ থেকে তুমি যা চাও, ইঞ্জেকশানের জন্যে তার কোনও ক্ষতি হবে না।' শ্লেষের হাসিতে

অনন্তনারায়ণের ঠোঁট বেঁকে গেল : 'বরং লাভই হবে।'

'ওর যদি কিছু হয়, আমি তোমাকে ছাড়ব না।' বড় বড় শ্বাস ফেলে সীতা বলল।

'সীতা!' অনন্তনারায়ণের স্বর কঠিন হল : 'অনেক ন্যাকামো হয়েছে! তুমি এখন যেতে পারো!'

সীতার মুখ থমথম করছে। চোখজোড়া জোড়-ভাঙা সাপিনীর মতো হিংস্র।

ও এক ঝটকায় উঠে চলে যাচ্ছিল, অনন্তনারায়ণ ডাকলেন : 'শোনো, একটা কথা পরিষ্কার বলে দিই। তোমার ঢলাঢলি নিয়ে আমি যেমন মাথা ঘামাচ্ছি না, তেমনি আমি চাই না, আমার গবেষণায় তুমি নাক গলাও। তাছাড়া মথুর সিংকে নিয়ে আমার গবেষণা এখন শেষ পর্যায়ে। এ-অবস্থায় ফেরার কোনও পথ নেই। কোনও পথ নেই।'

'ওর যদি কিছু হয়...!' কথা শেষ না করেই সশব্দে পা ফেলে বেরিয়ে গেল সীতা।

তখুনি একটা ভয়ঙ্কর জোরালো চিৎকার শোনা গেল।

বাতাসের প্রতিটি স্তরে বুকফাটা কাঁপুনি জাগিয়ে স্বরটা ভেসে আসছে কানে।

খাঁচার কুকুর চিৎকার করছে। তবে এ-চিৎকার কোনও কুকুরের নয়। যেন হিংস্র ক্ষুধার্ত নেকড়ের চিৎকার। দীর্ঘদিন নরকবাসের পর গলা ফাটিয়ে মুক্তি চাইছে। এ এক পাগল-করা চিৎকার।

চিন্তাগ্রস্ত মন নিয়ে খাঁচা-ঘরের দিকে রওনা হলেন অনন্তনারায়ণ। হাতে খাতা ও কলম। নতুন আচরণের কোনও লক্ষণ দেখলে সযত্নে তা লিখে রাখবেন তিনি। নেকড়ে-মানুষ নিয়ে গবেষণায় এক নতুন সন্ধিক্ষণে পৌঁছে গেছেন অনন্তনারায়ণ বসুরায়।

এখানে রাত মানেই গভীর রাত। শীতার্ত রাত। শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। খাঁচা-ঘরে ঢুকবার আগে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে নক্ষত্রময় আকাশ দেখছিলেন অনন্তনারায়ণ। ঘরের ভেতর থেকে চিৎকার ভেসে আসছে একইভাবে। হঠাৎই আর-একটা চিৎকার শুনতে পেলেন। বহুদূরের কোন অন্ধকার অতল থেকে প্রতিধ্বনিত হল একই ধরনের উত্তর। একজনের পাগল-করা প্রশ্নের পাগল-করা উত্তর দিচ্ছে আর-একজন।

অনন্তনারায়ণ রোমাঞ্চিত হলেন। একটা আশঙ্কার স্রোত বয়ে গেল শরীরের অভ্যন্তরে। দ্রুত পায়ে খাঁচা-ঘরে ঢুকলেন তিনি।

নেকড়ের কামড় খাওয়া কুকুরটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। হলদেটে সবুজ চোখ হিংস্র। ধারালো দংষ্ট্রা ভয়ঙ্কর। আর গর্জন নেকড়ের মতোই রক্ত-হিম করা। গত অমাবস্যার নেকড়েটা যেন ঢুকে গেছে নিরীহ সুস্থ কুকুরটার ভিতরে। শুরু হয়েছে ওটার অস্থির পাগলামি।

গবেষণার সফলতায় আত্মপ্রসাদ অনুভব করলেন অনন্তনারায়ণ। কুকুরটার পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য। কাল রাতে ওটার আচরণ আরও খুঁটিয়ে লক্ষ করতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় কুকুরটা তাঁকে অবাক করল! সুস্থ কুকুরটাকে নিয়মিতভাবে সিরাম ইনজেক্ট করছেন তিনি। কই, তার তো কোনও প্রভাব দেখতে পাচ্ছেন না! একইরকম শান্ত চুপচাপ ভঙ্গিতে ওটা দাঁড়িয়ে আছে খাঁচার ভেতরে—ঠিক তৃতীয় কুকুরটার মতো। দু'জনে মিলে সঙ্গীর হিংস্র উন্মত্ততা লক্ষ করছে কিছুটা ভয়ার্তভাবে।

খাতায় নোট নিতে লাগলেন অনন্তনারায়ণ।

প্রথম কুকুরটা থেকে-থেকেই দীর্ঘ চিৎকার করছে। দূরের পাহাড়-জঙ্গল থেকে ভেসে

আসা চিৎকারের জবাব দিচ্ছে।

তাহলে কি সিরামের চেয়ে জন্তুগুলোর মুখের লালা বেশি শক্তিশালী ! রক্তের সঙ্গে লালা সরাসরি মিশে গেলে অসুখটা অনিবার্য ভাবে সংক্রামিত হয় অন্য পশুর দেহে। মোটামুটি ভাবে বলা যায়; নেকড়ে ও কুকুর একই প্রজাতির। তাছাড়া, পলাতক জন্তুটা খাঁটি নেকড়ে ছিল না। ফলে খুব সহজেই ব্যাধির বীজ ছড়িয়ে পড়েছে কামড় খাওয়া কুকুরটার রক্তে। কিন্তু তাই বলে মানুষের বেলায়...

কাল পূর্ণিমার রাতে ব্যাধিগ্রস্ত জানোয়ারগুলো আরও পাগল হয়ে উঠবে। যদি সেই পাগলামির মধ্যে কিছু একটা ঘটে যায় ! অনন্তনারায়ণ খুব আশা করতে লাগলেন। তাঁর মন কোনও ঘটনার জন্য উদ্গ্রীব। যে-ঘটনা তাঁর গবেষণার সপক্ষে জোগাবে অকাট্য প্রমাণ। আসামের পাহাড়ী অঞ্চলে পড়ে থাকা বাবার ছিন্নভিন্ন মৃতদেহটার কথা তাঁর মনে পড়ছিল বারবার। আর মনে পড়ছিল সীতার হিসহিসে উচ্চারণ : 'ওর যদি কিছু হয় আমি তোমাকে ছাড়ব না !...ছাড়ব না !...'

অনন্তনারায়ণ চিন্তাকুল অভিব্যক্তি নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন। কালই শেষ ইঞ্জেকশান দেবেন মথুর সিং এবং প্রথম কুকুরটার দেহে। তারপর শুধু পর্যবেক্ষণ। এক পূর্ণিমা থেকে আর এক পূর্ণিমা পর্যন্ত দীর্ঘ একটি মাস খুঁটিয়ে সবকিছু লক্ষ করা। অপেক্ষা করা কোনও অমানুষিক হিংস্র আচরণ এক ঝলক দেখার জন্য।

ক্যাপ্টেন মথুর সিং ধীরে ধীরে পালটে যাচ্ছিল।

পাগলা ঝোরার মতো একটা অমানুষিক অস্থিরতা মাথা কুটে মরে ওর মনের ভেতরে। আগ্নেয়গিরির ফুটন্ত-লাভাস্রোতের মতো বেরিয়ে আসতে চায় বাইরে। ওর ইচ্ছে হয় বুকফাটা চিৎকার করে ডেকে উঠতে। চারপাশে আঁধার নেমে এলেই শরীরে জ্বালা ধরে। ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়। ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করে মাঠে, পাহাড়ে, জঙ্গলে। চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে মন্ত্রমুগ্ধের মতো। যুক্তি, বুদ্ধি, চিন্তা, সব কেমন জট পাকিয়ে যায়।

একদিন রাতে জওয়ান দেবীদয়ালকে নিয়ে মদের বৈঠকে বসে ছিল মথুর সিং। কথা বলতে বলতে দেবীদয়াল হঠাৎ জিগ্যেস করল, 'নেকড়ের জখম এখন কেমন আছে ?'

'সেরে গেছে।' গেলাসে বড়সড় চুমুক দিয়ে মথুর বলল।

সত্যিই সেরে গেছে ও। অনন্তনারায়ণ আপ্রাণ চেষ্টায় চিকিৎসা করেছেন। আর সেবা করেছে বটে সীতা ! মথুরকে এখন সীতার নেশায় পেয়েছে।

জন্তুটার কামড়ের ক্ষত সেরে উঠলেও নতুন কতকগুলো উপসর্গ তৈরি হয়েছে। শরীর ম্যাজম্যাজ করে, জ্বর জ্বর ভাব। আর মনমেজাজ মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক রকম তিরিক্ষে হয়ে ওঠে।

'দোস্ত, আশপাশের পাহাড়ে একটা নেকড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে !' দেবীদয়াল বলল : 'সেই পালানো জানোয়ারটাই নাকি ?'

দেবীদয়াল সব ঘটনাই জানে। মথুরের কাছ থেকে শুনেছে। তাছাড়া দুর্ঘটনার দিন সারারাত মথুর না ফেরায় সে খুব চিন্তিত ছিল। পরদিন সকালেই খোঁজখবর করে, মথুর সিংয়ের জিপ দেখে গিয়ে হাজির হয়েছে অনন্তনারায়ণ বসুরায়ের বাড়িতে। তখন সীতাকে ভর করে আহত মথুর বেরিয়ে আসছে।

মথুরকে জিপে বসিয়ে দেবীদয়ালই জিপ চালিয়ে নিয়ে যায় ব্যারাকে। যেতে যেতে সব শোনে। তারপর হেসে বলে, 'এলে চিড়িয়া মারতে, আর নেকড়ের হাতে চোট হয়ে গেলে ? আজব হিসেব তোমার প্রভু বদ্রীনাথ !'

মথুরও ঠাট্টার সুরে জবাব দিয়েছে, 'গোলাপেও কাঁটা থাকে, দোস্ত।' তারপর একটু থেমে সিরিয়াসভাবে বলেছে, 'তবে জানোয়ারটা পালিয়েছে। ওটার গায়ে গুলি লেগেছে কিনা জানি না...'

সেই নেকড়েটাই হয়তো ঘুরে বেড়াচ্ছে আশেপাশে।

মথুর সিং কোনও জবাব দিল না স্পষ্ট করে। বলল, 'হতে পারে।'

দেবীদয়ালের কপালে ভাঁজ পড়ল। বলল, 'গাঁয়ে শুনছিলাম, কয়েকটা মুরগি, ভেড়া, ছাগল চুরি হয়েছে গত ক'দিনে। তার মধ্যে একটা ভেড়ার বডি পাওয়া গেছে চামোলি আর চোপ্‌তার মাঝামাঝি জঙ্গলে। দাঁতে নখে ছিঁড়ে বডি ফালা ফালা, সারা জায়গাটা রক্তে মাখামাখি, কিন্তু জানোয়ারটা খায়নি কিছুই...'

'ওয়্যারউল্‌ফ !' মথুর সিংয়ের নেশার মাঝে অনন্তনারায়ণ বসুরায়ের প্রিয় শব্দটা ঝলসে উঠল নিমেষে। হিংস্র খুন-পাগল নেকড়ে !

দেবীদয়াল বলল, 'গাঁয়ের লোকেরা ভয় পেয়ে গেছে। আমাদের এসে বলছিল জানোয়ারটাকে শিকার করার জন্যে। আমি ক'দিন ধরে চেষ্টা করছি, কিন্তু বাগে পাচ্ছি না।'

বয়েস অল্প হলেও দেবীদয়ালের সাহস অল্প নয়। মিলিটারি রামের অবশেষটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে সে মজা করে বলল, 'দোস্ত, বাঁচতে গেলে নেশা চাই, এক্‌সাইটমেন্ট চাই। তোমার তো নেশাও আছে, এক্‌সাইটমেন্টও আছে।' চোখ টিপল সে : 'আর আমার এখন শুধু নেশা।' একটা গেলাস তুলে ধরল অলস হাতে : 'নো এক্‌সাইটমেন্ট। তাই শালা নেকড়েই শুট করব !'

দেবীদয়ালের ওপরে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল মথুরের। কিন্তু কেন যে হচ্ছিল তার কোনও ব্যাখ্যা ছিল না ওর কাছে। ও শুধু ভাবছিল, পলাতক সেই নেকড়েটার কথা। দিশেহারা জন্তুটা এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথাও নিশ্চিন্ত বোধ করছে না।

সেই বৈঠকের পর থেকে সহজে দেবীদয়ালের টিকি দেখতে পায় না মথুর সিং। প্রায় সর্বক্ষণের বন্ধু কি দূরে সরে যাচ্ছে ? এবং তার কারণ কি সীতা ?

চিকিৎসার পালা শেষ হলে অনন্তনারায়ণের বাড়ি আর যায়নি মথুর। সীতাই কেমন অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল। সীতাকে মথুর সিং ভালোবাসে না। বরং সে ক্রীতদাস হয়ে পড়েছে সীতার যৌবনের, ওর যৌবন-খেলার সুপটু ছলা-কলা-কৌশলে। সীতাকে কাছে পাওয়ার জন্য ওর কাণ্ডজ্ঞান যখন-তখন লোপ পায়। সেই কারণেই মথুরের দৃঢ় বিশ্বাস, অনন্তনারায়ণ ওদের দু'জনের মেলামেশার ব্যাপারটা বেশ ভালোরকমই আঁচ করতে পেরেছেন। তাছাড়া বিজ্ঞানী ভদ্রলোককে তেমন ঈর্ষাকাতর বা হিংস্র বলে মনে না হলেও মথুর অনুভব করেছে সীতা তাঁকে ভয় পায়। এড়িয়ে চলতে চায়। অচেনা-অজানা জিনিসকে মানুষ যেমন ভয় পায়, এ-ভয় অনেকটা সেইরকম।

বাড়িতে না গেলেও প্রতিদিন নিয়মমাফিক সীতার সঙ্গে দেখা হয়েছে মথুরের। তারপর যা যা হওয়া অনিবার্য, তাও হয়েছে। কখনও পাইন-দেবদারুর জঙ্গলে, কখনও অলকানন্দার কাছাকাছি রডোডেনড্রনের ঝোপে, কখনও বা সন্ধের মুখে কোনও পাহাড়ী টিলার আড়ালে।

অমাবস্যার সন্ধ্যায় ক্যাম্পের কাছাকাছি সামান্য ঝোপঝাড়ের ফাঁকে বসে ছিল মথুর আর সীতা। কাছেই মথুরের জিপ দাঁড়িয়ে। ঘাসে ঢাকা জমির ওপরে পুরু কম্বল বিছিয়ে দিয়েছে মথুর। শীতের পোশাকে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে সীতা জড়োসড়ো। মথুরের পাশেই পাঁচ ব্যাটারির টর্চ, রামের বোতল, জলের বোতল। নেশা ওর জমে গেছে বহু আগেই। আর এক্সাইটমেন্টও কড়া নাড়ছে মনের দরজায়।

'রাত-বিরেতে জঙ্গলে আসার কী যে এক নেশা তোমাকে পেয়ে বসেছে বুঝি না—' আদরে জর্জর হতে হতে অস্ফুট গলায় বলল সীতা।

'উম্-ম্...আমিও বুঝি না। শুধু জানি আসতে ভালো লাগে।' মথুর জড়ানো স্বরে বলে।

ঘন কুয়াশা আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়ায়। নক্ষত্র ঢাকা পড়ে। শীত বাঘ হয়ে কামড় বসায় দেহে।

সীতার শরীরে কাঁটা দেয়। ও মথুরকে আঁকড়ে ধরে। গাছের পাতা কলরব করে অন্ধকারে। মথুর আনন্দে উত্তেজনায় কামড় বসায় সীতার ফরসা নরম ঘাড়ে। সীতা 'উঃ' শব্দে আদুরে প্রতিবাদ জানায়। মথুরের পাগলামি আরও বেড়ে যায়।

'তুমি দিন-দিন বড় অসভ্য হয়ে যাচ্ছ!' এক আশ্চর্য উত্তাপ-তরঙ্গ সীতার আকর্ষণীয় দেহে খেলে যাচ্ছে। একই সঙ্গে সমস্ত সংযম ও নিয়ন্ত্রণ ভেসে যাচ্ছে অনাথ শিশুর মতো।

'অসভ্য!' হাসল মথুর : 'আমি কি নেকড়ে হয়ে গেছি? নাকি তোমার স্বামীর ভাষায় ওয়্যারউল্ফ হয়ে গেছি?' ঠোঁটে ঠোঁট ঘষে আদর করল। মুখে মুখ, শরীরে শরীর।

ঠিক তখনই একটানা ভয়ঙ্কর চিৎকারটা ভেসে এল দূর থেকে। নেকড়ের চিৎকার। অমাবস্যার অন্ধকারে উন্মাদ হয়ে ডাকছে।

সীতা কাঠ হয়ে গেল মুহূর্তের জন্য। সেই পালিয়ে যাওয়া পশুটা! একটা হিংস্র জন্তু কীভাবে যেন বদলে দিল সীতার জীবনধারা, যৌবনধারা। ও মাঝে মাঝে ভাবতে চেষ্টা করে, কেন এমনটা হল! কিন্তু কোনও উত্তর খুঁজে পায় না। ওর পুরনো মানসিক রোগ, মানসিক অস্থিরতা, সব যেন ফিরে এসেছে নতুন করে। এসেছে সেই পূর্ণিমা রাতের পর থেকে। রুপোলি চাঁদ বোধহয় জাদু জানে।

চিৎকারটা কানে ঢুকতে যতক্ষণ। তারপরই মথুর সিংয়ের রক্তে যেন শিহরণ খেলে গেল। অসংখ্য অগণ্য উল্লাসকণা মিশে গেল ওর রক্তের লোহিত ও শ্বেতকণিকার সঙ্গে। আদর আরও তীব্র হল। দূরের চিৎকার এক অমানুষিক তেজ-তরঙ্গ ছড়িয়ে দিচ্ছে রহস্যময় শীতল পরিবেশে। পাশবিক হাহাকার কখনও জোরালো, কখনও-বা ক্ষীণ। বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন লয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। তৈরি হচ্ছে এক অদ্ভুত মায়া, অদ্ভুত বিভ্রম।

পর-পর দুটো গুলির শব্দ শোনা গেল। পর্বতভূমি যেন কেঁপে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রণাকাতর জান্তব আর্তনাদ। যেন খুব দূরে নয়, অথচ তেমন কাছেও নয়।

মথুর সিং বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল। ওর উত্তেজিত শরীর এক আশ্চর্য যন্ত্রণায় মথিত হল। ও উঠে বসল ঝটিতি।

'কী হল?' সীতা অবাক হয়ে জিগ্যেস করল।

মথুরের বুকের ভেতর কেমন যেন কষ্ট হচ্ছিল। একটা চাপা রাগ মাথা কুটে মরছিল নিষ্ফল আক্রোশে। ও উঠে দাঁড়াল। সব কিছু গুছিয়ে নিতে নিতে বলল, 'চলো, যেতে

হবে।'

পোশাক ঠিক করে নিচ্ছিল সীতা। বলল, 'কোথায় ?'

'জানি না !'

কম্বল, টর্চ ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে দ্রুত পায়ে রওনা হল মথুর সিং। সীতা উদ্‌ভ্রান্তের মতো ওকে অনুসরণ করল। ওর মন কু. গাইছিল। শরীর এখন উষ্ণ থেকে হিম হয়ে যাচ্ছে। বাতাস বিঁধছে গায়ে।

জিপে উঠেই স্টার্ট দিল মথুর। ফগ লাইট জ্বেলে দিল। গাড়ি চাপা গর্জন তুলে গতি নিল। সীতা ওর পাশে জড়োসড়ো হয়ে বসে। এক অমানুষিক তরঙ্গ মথুরের শরীর থেকে বেরিয়ে সীতার দেহে ঢুকে যাচ্ছিল প্রবলভাবে। ওর মনে হল, জান্তব চিৎকারটা স্তব্ধ হয়ে চরাচর যেন নিঃশব্দ হয়ে গেছে। মথুরকে আড়চোখে দেখল। ও একদৃষ্টে সামনের দিকে তাকিয়ে। সে-দৃষ্টিতে দুর্জ্ঞেয় প্রতিজ্ঞা।

সীতাকে বাড়ির কাছাকাছি নামিয়ে দিল মথুর। বলল, 'তুমি যাও ! কাল দেখা হবে।'

তারপর এতটুকু সময় নষ্ট না করে জিপ ছেড়ে দিল।

আর সংশয়ভরা পায়ে উঁচু-নিচু পথ পেরিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হল সীতা।

বাড়িতে ঢুকতেই এক ভয়ঙ্কর ঝটাপটির শব্দ ও ক্রুদ্ধ হিংস্র গর্জন কানে এল সীতার। স্বামীকে কোনও ঘরে না দেখতে পেয়ে ও বুঝল তিনি খাঁচা-ঘরে গেছেন। এবং ভয় পাইয়ে দেওয়া শব্দগুলো আসছে ওখান থেকেই।

ক্যাম্পের কাছাকাছি এসেই কিছু মানুষের জটলা নজরে পড়ল মথুর সিংয়ের। ও জিপ থামিয়ে নামল।

গাড়োয়ালিদের কয়েকটা ঘরের সামনে দুটো ধুনি জ্বলছে। ধুনি ঘিরে বেশ কিছু গাঁয়ের লোক শরীর তাপিয়ে নিচ্ছে। এছাড়াও একটা বড় ভিড় রয়েছে। উচ্চকিত কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে।

বুনো ঝোপের জঙ্গল পেরিয়ে সামান্য চড়াই ভেঙে জটলার কাছে গিয়ে হাজির হল মথুর সিং। তখনই পুরুষালী স্বরে ভাঙা কান্না শুনতে পেল। আর দেখতে পেল দেবীদয়ালকে।

দুটো মৃতদেহ ঘিরে জটলা করে ছিল মানুষগুলো। একটা বড়সড় বীভৎস নেকড়ে, আর অন্যটা একটা কালো কুকুরের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মৃতদেহ।

নেকড়েটা কাত করে শোয়ানো। পেটের কাছ থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়েছিল, এখন জমাট বাঁধছে। আর ডান চোখের জায়গায় একটা ভয়াবহ লাল গর্ত। অন্য চোখটা ঘোলাটে। সবুজ ধকধকানি অদৃশ্য।

গাঁয়েরই একটা লোক কুকুরের মৃতদেহের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছিল। কান্নার জড়ানো সুরের ভেতরে 'কাল্লু' শব্দটা শোনা যাচ্ছিল। উপস্থিত অন্যান্য মানুষ হারিয়ে যাওয়া মুরগি, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা করছে। আর বারবারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে জওয়ান দেবীদয়ালের কাছে, শাবাশ দিচ্ছে তাকে। দু'-একটা কাচ্চা-বাচ্চা হাজির হয়ে নেকড়েটার বিশাল আকৃতি নিয়ে অবাক হয়ে নিজেদের মধ্যে নানান মন্তব্য করছে।

মথুর সিং অতি কষ্টে নিজেকে সংযত রাখছিল। দেবীদয়াল ওর কাছে গিয়ে কাঁধে হাত

রাখল। বলল, 'ইয়ার, শালে কো আজ মার দিয়া।'

মথুর জ্বলে উঠল : 'তেরে কো কেয়া কিয়া থা !'

দেবীদয়াল অবাক হয়ে থতিয়ে গেল। হাত নামিয়ে নিল কাঁধ থেকে।

মথুর বুঝতে পারছিল, ওর প্রতিবাদ করার কোনও কারণ নেই, থাকতে পারে না, কিন্তু তবুও ওর ভেতর থেকে কে যেন কলকাঠি নাড়ছিল। রাগের ফোয়ারা ঘৃণার থুতুর মতো ছিটিয়ে দিতে চাইছিল দেবীদয়ালের মুখে।

'এই জানোয়ারটা গাঁয়ের লোকের সর্বনাশ করছিল, সাব !' গোবেচারা চেহারার একটি লোক মথুরকে লক্ষ করে বলল।

মথুর ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখল একবার। কিছু বলল না।

দেবীদয়াল বন্ধুর অস্বাভাবিক আচরণ গ্রাহ্য না করে ঘটনাটা সংক্ষেপে বলে চলল।

যে-লোকটি কাঁদছে, তার নাম বীরদেও। বীরদেওর পোষা কুকুর ছিল কাল্লু। সে কুকুর নিয়ে যেখানে-সেখানে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াত। আজও সেইরকমই ঘুরে বেড়াচ্ছিল নীচের মাঠে, খেতে, জঙ্গলে। দেবীদয়াল গিয়েছিল বদ্রীনাথের দিকে দেশে চিঠি পাঠানোর ব্যবস্থা করতে। ফেরার পথে সে উদ্‌ভ্রান্ত বীরদেওকে দেখতে পায়। সে পাগলের মতো কাঁদছে, চিৎকার করছে। একটু আগেই তার পোষা কুকুরকে নাকি নেকড়ে বাঘে নিয়ে গেছে। দেবীদয়াল তো আগে থেকেই জানোয়ারটাকে খুঁজছিল। সুতরাং সে বীরদেওকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে যায় জঙ্গলের দিকে।

সন্ধে ঘনিয়ে আসার পর নেকড়েটাকে ওরা দেখতে পায়।

একটা পাথরের ওপরে জানোয়ারটা বসে আছে। ওটার সামনে কাল্লুর ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ। জন্তুটা মৃতদেহটা আগলে বসে আকাশের দিকে মুখ তুলে ডাকছিল। তখনই দেবীদয়াল নির্ভুল লক্ষ্যে ওটাকে গুলি করে। দু'-বার। তারপর মৃতদেহ দুটো ওরা বয়ে নিয়ে আসে গ্রামের দিকে।

মথুর সিং আর কিছু শুনছিল না। ওর মুখের ভেতরে থুতু জমছিল। মৃত নেকড়েটার দিকে এক ঝলক দেখে নিয়ে ও পিছন ফিরল। তারপর শব্দ করে থুতু ছেটাল মাটিতে। বন্ধুর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। চাপা গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'সব কুছ সমঝ গয়া, ইয়ার। তোমার পরমবীরচক্র উপাধি পাওয়া উচিত !' মথুর চলে গেল।

দেবীদয়াল সব ব্যাপারে অত মাথা ঘামানো পছন্দ করে না। সুতরাং হাসিমুখেই সে গাঁয়ের মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর তো তোমাদের ভেড়া-ছাগল চুরি যাওয়ার ভয় নেই। তো এসো, ফুর্তি করো ! দারু লেআও !'

গাঁয়ের মানুষগুলো ফুর্তিতে মেতে উঠল। বীরদেও তখনও ভাঙা গলায় কেঁদে চলেছে।

ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার পথে গাঁয়ের হই-হুল্লোড়ের শব্দ আবছাভাবে মথুর সিংয়ের কানে পৌঁছে গেল। ওর মাথার মধ্যে ঘুরছে শুধু দুটো নাম : দেবীদয়াল ! বীরদেও ! দেবীদয়াল ! বীরদেও !...

একটা হিংস্র গর্জন যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেরিয়ে আসতে চাইছে ওর পুরুষালী ঠোঁট চিরে।

অনন্তনারায়ণ দুটো কুকুরের হিংস্র লড়াই দেখছিলেন।

পূর্ণিমার রাতে রোগগ্রস্ত কুকুরটা শুধু চিৎকার করেই ক্ষান্ত থেকেছে। অথচ সিরাম ইনজেক্ট-করা কুকুরটা অনেক বেশি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অনন্তনারায়ণ আশা-নিরাশার দোলায় দুলছিলেন। শেষ পর্যন্ত মনস্থির করলেন, আসন্ন অমাবস্যায় এই দুটো কুকুরকে মুখোমুখি যুদ্ধে দাঁড় করাবেন। ওদের খাঁচার মাঝখানের দেওয়াল নেবেন সরিয়ে। বীরদেওকে দিয়ে এমন ব্যবস্থা করালেন, যাতে বাইরে থেকে কয়েকটা পেরেক ও কাঠ খুলে নিলে খাঁচার মাঝের তক্তার দেওয়ালটা একপাশে কাত হয়ে পড়ে যায়। তখন দুটো শ্বাপদ বিনা বাধায় পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে। আর পরস্পরকে ছিঁড়তে পারবে দাঁত-নখে।

এখন, এই মুহূর্তে, সেই ঘটনাই ঘটে চলেছে।

প্রথম কুকুরটা ঝাঁপিয়ে পড়েছে দ্বিতীয় কুকুরটার ওপরে। ধারালো দাঁতের কামড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে মুঠো মুঠো লোম। খাবলে নিচ্ছে মাংস। দ্বিতীয় কুকুরটা প্রথম দিকে কিছুটা ভয়ত্রস্ত ছিল, বাঁচবার চেষ্টা করছিল শত্রুর দাঁত-নখের আঘাত থেকে। কিন্তু বারদুয়েক ভয়ঙ্করভাবে আক্রান্ত হওয়ার পরই প্রাণীটা কোণঠাসা জন্তুর মতো রুখে দাঁড়াল। আচমকা এক জোরালো কামড় বসিয়ে দিল প্রথমজনের পেটে। রক্ত বেরিয়ে এল গলগল করে। বেরিয়ে এল নাড়িভুঁড়ির কিছু অংশও। প্রথম কুকুরটা পালটা ঝাঁপিয়ে পড়ল। থাবা বসিয়ে দিল অপরের চোখে। কখনও গর্জন, কখনও আর্তনাদ, কখনও চিৎকার। কাঠের দেওয়ালে এলোপাতাড়ি ধাক্কা খাচ্ছে লোমশ শরীরগুলো। তৃতীয় কুকুরটা একটানা কেঁউ কেঁউ স্বরে ডেকে চলেছে। জড়োসড়ো হয়ে সিঁটিয়ে গেছে খাঁচার এককোণে।

অনন্তনারায়ণ জ্বলজ্বলে চোখে ওদের দেখছিলেন। এক অদ্ভুত উল্লাস, অদ্ভুত নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। এই পর্যবেক্ষণ ধীরে ধীরে গড়ে তুলবে তাঁর গবেষণার ধাপ। মাঝে মাঝে ওভারকোটের পকেটে হাত দিয়ে নাইন মিলিমিটার পিস্তলটা অনুভব করছেন। মথুর সিংয়ের মতো পাগল পশুগুলোর কামড় খেতে চান না তিনি।

ক্ষুব্ধ গর্জন, যন্ত্রণাময় চিৎকার ক্রমশ বাড়ছিল। খাঁচার ভেতরটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। প্রথম কুকুরটা এখনও সমান তেজিয়ান, কিন্তু দ্বিতীয় কুকুরটা অনেকখানি নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। শরীর দু'জনেরই ক্ষতবিক্ষত। খুবলে নেওয়া মাংসপিণ্ড, চামড়া ঝুলছে। নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে বীভৎসভাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও লড়াই চলছে। চলবেও। একজনের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত। এ-লড়াইয়ের ক্ষান্তি নেই।

এমন সময় হঠাৎই প্রথম কুকুরটা প্রতিদ্বন্দ্বীর গলায় এক ভয়ানক কামড় বসিয়ে দিল। সবক'টা ধারালো দাঁত ডুবে গেল নরম মাংসে। দ্বিতীয় কুকুরটা তীব্র আর্তনাদ করে উঠল। কিন্তু মাঝপথে হঠাৎই থেমে গেল সেই মরণ আর্তনাদ। কুকুরটা লুটিয়ে পড়ল তক্তার দেওয়ালের ওপরে। অথচ তখনও প্রথমজনের দাঁত বসে আছে তার গলায়। এমনভাবে দাঁতগুলো মাংস ভেদ করে ঢুকে গেছে যে, জোরালো ঝাঁকুনি দিয়েও প্রথম কুকুরটা নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য!

অনন্তনারায়ণ বসুরায়ের গা গুলিয়ে উঠল।

বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় বিজয়ী কুকুরটা নিজেকে ছাড়াতে পারল। তারপর মৃতদেহটাকে ঘিরে খাঁচার ভেতরেই ঘুরপাক খেতে লাগল। চাপা গর্জন ছিটকে বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে। কখনও লাল জিভ বের করে ছড়িয়ে থাকা রক্ত চেটে নিচ্ছে, কখনও চাটছে নিজের রক্তাক্ত শরীর।

কুকুরটা হঠাৎই থমকে দাঁড়িয়ে অনন্তনারায়ণকে একবার দেখল। হলদে-সবুজ চোখে

অংশটি খুব খাড়া। আর বরফ ভেঙে ভেঙে সেখানে যেন তৈরি হয়ে গেছে বিশাল বিশাল সিঁড়ির ধাপ। সিঁড়িটা সোজা উঠে গেছে চৌখাম্বা অথবা বদ্রীনাথ শিখরের চূড়ায়। কিংবদন্তী বলে, পঞ্চপাণ্ডবেরা এই পথ ধরেই গিয়েছিলেন। বসুধারা প্রপাতে স্নান করে তাঁরা রওনা হয়েছেন স্বর্গের দিকে। এখানে পর্বতের পাদদেশে সতোপন্থ তাল নামে একটি হিম-সরোবর আছে। গাড়োয়ালিদের মৃতদেহ প্রথমে নাকি এই সরোবরে নিয়ে আসা হয়। সরোবরে স্নান করানোর পর দাহ করা হয়।

কাল্লুর মৃতদেহ এখন সেই সতোপন্থ তালের দিকেই নিয়ে চলেছে বীরদেও। প্রিয় পোষ্যকে যথাবিধি সৎকার করতে কোনও পরিশ্রমেই সে পিছপা নয়। তাই একমনে পাহাড়ী পথ ভাঙছে। ঝোপ-জঙ্গল-টিলা পেরিয়ে যাচ্ছে।

রোদ এখনও নিস্তেজ। অলকানন্দার নীল জল দুর্বার বেগে ছুটে চলেছে বদ্রীনাথের দিকে। বীরদেও বিড়ি টানছিল, আর আপনমনেই বিড়বিড় করে কথা বলছিল মৃত কাল্লুর সঙ্গে। সে-কথা নিছকই নেশাগ্রস্ত মাতালের খাপছাড়া বকবকানি।

এভাবেই পথ চলতে চলতে, পায়ের শব্দ, ঝোপঝাড়ের খসখস, নুড়ি-পাথর সরে যাওয়ার অস্ফুট আওয়াজ ইত্যাদি কানে আসতে লাগল বীরদেওর। প্রথমটা সে শব্দগুলোকে ততটা আমল দেয়নি। মনের ভুল বলেই ভেবেছে। কিন্তু সকালের নির্জন পাহাড়ী পথে শব্দগুলোকে ভুল করার কোনও উপায় নেই। সুতরাং সে ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু কী কারণে, তা জানে না। কাল রাতে যে-নেকড়েটা মারা গেছে, তারই কোনও দোসর ঘুরে বেড়াচ্ছে না তো আশেপাশে! বীরদেও চলার গতি বাড়িয়ে দিল।

সতোপন্থ সরোবর থেকে ভিজে পুঁটলি কাঁধে ফেরার সময়েও খুঁটিনাটি শব্দগুলো বীরদেওকে অনুসরণ করতে লাগল। সে কাল্লুর শোকে কাঁদছিল। মুখে যা আসে তাই বলে মৃত নেকড়েটাকে গালাগাল করছিল একই সঙ্গে। ফলে শব্দগুলোকে কোনও গুরুত্বই দেয়নি সে। অভ্যস্ত পায়ে উতরাই পথ বেয়ে নামছিল। এমন সময় দেখল শ্বেতাঙ্গ দুই হিপি-হিপিনী এগিয়ে আসছে।

বছরের বেশিরভাগ সময়েই এরা এই অঞ্চলে যাতায়াত করে। কেউ ভ্রমণে আসে, কেউ-বা আসে ট্রেকিং-এ। বীরদেও শুনেছে, মাঝে-মধ্যে কোনও কোনও চোরাকারবারীর হদিসও নাকি পাওয়া যায়। সে যাই হোক, শ্বেতাঙ্গ দু'জন কাছাকাছি আসতেই বীরদেও তাদের সামনে হাত পাতল। কাল্লুর শোকে চোখে জল সামান্য ছিলই, শুধু মনের আবেগ ঢেলে সেটাকে জোরদার করার চেষ্টা করল। তারপর ভাঙা ইংরিজিতে বলল, 'স্যার, হেল্প, নো মানি। ডগ ডেড।'

ইঙ্গিতে কাঁধের ওপরে ফেলা পুঁটলিটা দেখাল সে। শ্বেতাঙ্গ দু'জন কোনও ভ্রূক্ষেপ না করে বিরক্তির হাত নেড়ে বীরদেওকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

বীরদেও হতাশ হয়ে আবার পথ চলতে লাগল। আপন খেয়ালে নানান কথা বলে কাল্লুর জন্য দুঃখ করতে লাগল। এমন কথাও সে বলল যে, তার আর বাঁচতে ইচ্ছে করছে না।

পরদিন সকালে বদ্রীনাথের কাছাকাছি জঙ্গলে দু'জন উপজাতির মানুষ বীরদেওর মৃতদেহ আবিষ্কার করল। জঙ্গলে তারা কাঠ কাটতে ঢুকেছিল। তখনই ঘাস-পাতার ওপরে ছিন্নভিন্ন মৃতদেহটা দেখতে পায়। রক্ত আর মাংস নিয়ে কেউ যেন নারকীয় উৎসব করেছে।

★

ব্যারাকে বসে মথুর সিং মদে ডুবে ছিল। বীরদেওর মৃত্যুসংবাদটা দেবীদয়ালই এসে ওকে জানাল।

'বীরদেও লোকটা নেকড়ের হাতে মারা গেছে।'

মথুর লাল চোখ মেলে তাকাল। কর্কশ স্বরে বলল, 'জানি—'

দেবীদয়াল একটু অবাক হচ্ছিল। কারণ, সকালবেলাতেই মথুর মদ নিয়ে এভাবে বসে না। তাছাড়া আজ কতকগুলো জরুরি কাগজপত্র নিয়ে ওর মানা গিরিপথের ক্যাম্পে যাওয়ার কথা।

দেবীদয়াল আপনমনেই যেন বলল, 'কাল রাতে লোকটা মারা গেছে। আজ সকালে বডি পাওয়া গেছে—যদিও অবশ্য তাকে ঠিক বডি বলা যায় না।... এখানকার জঙ্গলে এত নেকড়ে আছে তা তো কোনওদিন শুনিনি!'

মথুর সিং গুম হয়ে বসে রইল।

দেবীদয়াল ওকে খোশমেজাজ করার চেষ্টায় সীতার প্রসঙ্গ টেনে আনল।

'গুরু, সেই সায়েন্টিস্ট-এর জরুর খবর কী? মোলাকাত চলছে?'

মথুর সিং হঠাৎ যেন জ্বলে উঠল। হাতের ঝটকায় বোতল গেলাস সব উলটে দিয়ে একটা ক্রুদ্ধ শব্দ করল। মথুরের লোমশ হাত আরও বেশি লোমশ দেখাচ্ছে। ফরসা রঙে কিছুটা কালচে ছোপ। জ্বালা-ধরানো গলায় সে কী যেন বলল। কথাগুলো জড়িয়ে যাওয়ায় দেবীদয়াল ঠিক বুঝতে পারল না। তবে তার মধ্যে আদেশের সুর ছিল।

দেবীদয়াল আহত হল। মথুরের সঙ্গে তার অনেকদিনের বন্ধুত্ব। সেই বন্ধুত্বে ওদের পদমর্যাদার তফাতটা কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। আজ এই প্রথম ক্যাপ্টেন মথুর সিং তার সঙ্গে কথা বলল। সামরিক বাহিনীতে, এখানকার ক্যাম্পে, ওদের বন্ধুত্ব নানান আলোচনার বিষয় ছিল। অথচ আজ...

'গুড বাই, ক্যাপ্টেন সিং!' দেবীদয়াল জোরালো গলায় বলল। তারপর দূরে দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা একসারি রাইফেলের দিকে তাকিয়ে আত্মগতভাবে উচ্চারণ করল, 'একটা নেকড়ে শেষ করেছি, আরেকটাকেও খতম করতে পারব! নইলে এ-গাঁয়ের মানুষগুলো বাঁচবে না।'

ক্ষুব্ধ দেবীদয়াল চলে গেল।

মথুর সিং যে-চোখে তার চলে যাওয়া দেখল তাকে ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। একটা ঠাণ্ডা থমথমে ভারী আবহাওয়া ক্যাম্পের ভেতরে জমাট বাঁধছিল। ঘরে উপস্থিত অন্যান্য সামরিক মানুষ এই নাটক খেয়াল করল না, অনুভব করল না।

একটু পরেই মথুর সিং বিস্রস্ত বেশবাস সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। সীতার সঙ্গে দেখা করতে যাবে ও। একই সঙ্গে দেখা করবে অনন্তনারায়ণ বসুরায়ের সঙ্গে। তিনি তো মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। হয়তো ওর এই অস্থির মানসিক পরিবর্তনের সরল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মথুর সিং অনিশ্চিত পা ফেলে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। তারপর হেঁটেই রওনা হল অনন্তনারায়ণের বাড়ির দিকে।

মনোবিজ্ঞানীর চেহারা এ-ক'দিনে অনেকখানি পালটে গেছে। মুখে নেমে এসেছে বার্ধক্যের ছাপ। গত কয়েক ঘণ্টায় বহু নতুন বলিরেখা আঁকিবুকি কেটেছে। চোখের

উজ্জ্বলতা নিভে এসেছে। চুলের রং আরও দ্রুত পালটে যেতে চাইছে।

খানিকটা অসহায় ও বিপর্যস্ত ভাব নিয়ে অনন্তনারায়ণ বসবার ঘরে একটা আরামকেদারায় ক্লান্ত দেহে শুয়ে ছিলেন। সামনে টেবিলের ওপরে গবেষণার কাগজপত্র ও কয়েকটা বই ছড়ানো। চোখ বুজে ওলটপালট হয়ে যাওয়া ঘটনাগুলো ভাবছিলেন তিনি। গবেষণার ফল তিনি হয়তো পাচ্ছেন, কিন্তু হিসেবে কিছুই মিলছে না। কেন? কেন?

বীরদেওর মৃত্যুসংবাদ পেয়েছেন তিনি। ওর কুকুরের মৃত্যুর খবরও পেয়েছিলেন। পর পর দুটো মৃত্যু তাঁকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। প্রথমত, নেকড়ে-মানুষ তত্ত্ব অনুযায়ী অমাবস্যা ও পূর্ণিমার চক্র পুরোপুরি খাপ খায়নি এ-দুটো ঘটনায়। দ্বিতীয়ত, পাগল নেকড়ে কি আরও এসে পড়েছে এদিকের অঞ্চলে? কারণ, তাঁর খাঁচা থেকে পালিয়ে যাওয়া নেকড়েটা দেবীদয়াল নামে এক সৈনিকের গুলিতে মরেছে বলে খবর পেয়েছেন তিনি। তাহলে বীরদেওর মৃত্যুর কী ব্যাখ্যা পাওয়া যায়?

লোকমুখে মথুর সিংয়ের খবরাখবরও নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন অনন্তনারায়ণ। কিছু কিছু খবর পেয়েছেন। আর একই সঙ্গে লক্ষ রেখেছেন প্রগল্‌ভা যুবতী সীতার ওপরে। সন্দেহ, সংশয়, অনুমান ইত্যাদি খেলা করেছে মনে। তবে নিশ্চিত হতে পারেননি। নেকড়ের লালা ও সিরামের প্রভাব কি সত্যিই আছে মানুষের ওপরে? তা যদি হয়, তাহলে নিয়মিত চক্রের ব্যাপারটা কি ওলটপালট হয়ে গেছে সিরাম ও লালা একই সঙ্গে প্রয়োগ করায়? চক্র বেতাল হলেও পরিবর্তনের ঘটনা যদি সত্যি হয়, তাহলে...

এক অসভ্য জংলী আনন্দ ফেটে পড়ল অনন্তনারায়ণের মনে। সুপ্রাচীন এক ভিনদেশী কিংবদন্তী জেগে উঠবে উত্তরপ্রদেশের এই অঞ্চলে।

ঠিক সেই সময়ে দরজায় শব্দ করে মথুর সিং ঘরে এসে ঢুকল।

অনন্তনারায়ণ চমকে চোখ মেলে তাকালেন। বললেন, 'আসুন, ক্যাপ্টেন সিং। কেমন আছেন?'

মথুর একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসল। বলল, 'আপনি তো মনোবিজ্ঞানী, ডক্টর বসুরায়। ক'দিন ধরে আমার মনটা খুব গোলমেলে হয়ে গেছে—'

অনন্তনারায়ণের বুকের ভেতরে ডমরু বাজতে লাগল। তিনি সোজা হয়ে বসলেন। অবাক চোখে মথুর সিংকে জরিপ করতে লাগলেন।

মথুর তখন নিজের অস্থিরতার কথা বলছিল। বলছিল, ওর ব্যবহার ইদানীং কেমন রুক্ষ হয়ে উঠছে। পোশাক-আশাক পরতে ভালো লাগে না। একা একা জঙ্গলে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে।

'চাঁদ দেখতে ভালো লাগে?' অনন্তনারায়ণ জিগ্যেস করলেন।

'হ্যাঁ।... কিন্তু কেন বলুন তো!' মথুর অবাক হয়ে জানতে চাইল।

অনন্তনারায়ণের শীত শীত করছিল। হঠাৎ শীতের কামড় যেন বহুগুণ বেড়ে গেল। কোনও উত্তর দিলেন না তিনি। শুধু মথুরকে দেখতে লাগলেন। বাস্তবকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

এমন সময় সীতা ঘরে এল। সাজগোজে উগ্র এবং লোভনীয় করে তুলেছে নিজেকে।

অনন্তনারায়ণ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বাস্তবে ফিরে এলেন। হাত বাড়িয়ে মথুরের ডান হাতটা টেনে নিলেন। খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

লোমশ হাত। চামড়া কেমন রুক্ষ, কর্কশ। নখগুলোতে ফ্যাকাসে ছাই রঙের আভা। নখের তলায়, নখের কোণে খুব সামান্য কালচে দাগ। সীতা অনন্তনারায়ণকে লক্ষ করছিল। আর মথুর থেকে-থেকেই কামার্ত নজরে দেখছিল প্রেয়সীকে।

'আপনাকে কতকগুলো কথা আমি বলব। সেগুলো বলামাত্র যে-কথাটা আপনার মনে আসে সেটা সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, কেমন!' অনন্তনারায়ণ মথুরকে বললেন।

মথুর ক্লিষ্ট হাসল।

'বলুন!'

অনন্তনারায়ণ গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, 'রাত।'

'অন্ধকার।'

'জঙ্গল।'

'চাঁদ।'

'নেকড়ে।'

'নেকড়ে-মানুষ।'

'কিংবদন্তী।'

'বাস্তব।'

অনন্তনারায়ণ থেমে একটু দম নিলেন। স্পষ্ট বুঝতে পারছেন, মথুর সিং ধাপে ধাপে উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। একই সঙ্গে সীতাও। তিনি মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে আবার বললেন, 'বীরদেও।'

'মৃত্যু।'

'ঘরবাড়ি।'

'বন-জঙ্গল।'

'সীতা!'

'মথুর।'

'দেবীদয়াল।'

'শত্রু।'

সীতা মুখে হাত দিয়ে ডুকরে উঠেছে হঠাৎ। অনন্তনারায়ণ থেমে গেলেন। মথুর সীতাকে দেখছে। অভিব্যক্তিতে নির্লজ্জ কামনা প্রকাশ পাচ্ছে।

'ক্যাপ্টেন সিং! আপনার কোনও অসুখ নেই। আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ। সুতরাং যা ইচ্ছে করবে সেটাই করবেন। কখনও ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাবেন না।'

মথুর সীতার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে অনন্তনারায়ণের কথায় সমর্থন জানাচ্ছিল। আর অন্তর্লীন উল্লাসে উথাল-পাথাল হচ্ছিলেন নেকড়ে-মানুষ বিশেষজ্ঞ মনোবিজ্ঞানী।

'থ্যাঙ্ক য়ু, ডক্টর।' বলে মথুর সিং উঠল।

সীতা ছোট্ট করে ওকে ডাকল, 'এসো—'

তারপর ওরা দু'জনে বসবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

অনন্তনারায়ণ জানেন ওরা এখন কিসে ব্যস্ত হবে। কিন্তু সে-চিন্তাকে বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় না দিয়ে তিনি আবার নিমগ্ন হলেন গবেষণার খতিয়ানে। মথুর সিং সম্পর্কে পর্যবেক্ষণের যেসব নোট নেওয়া ছিল তাতে নতুন সংযোজন শুরু করলেন কলম নিয়ে।

কিন্তু তিনি জানতেন না, আগামী দিনগুলো তাঁর জন্য কী সংবাদ নিয়ে আসছে।

★

বীরদেওর মৃত্যুর পুনরাবৃত্তি ঘটে গেল একাদশীর রাতে।

এবারের শিকার জওয়ান দেবীদয়াল।

অস্থির আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। আতঙ্কের ঢেউ ছোট ছোট তরঙ্গমালা হয়ে ছুঁয়ে গেল গোপেশ্বর, মানা, বদ্রীনাথ, চামোলি, যোশীমঠ প্রভৃতি অঞ্চল।

চোপ্‌তার জঙ্গলে পাওয়া গেল দেবীদয়ালের বীভৎস মৃতদেহ। অসহ্য ক্রোধে কেউ টুকরো টুকরো করে ছিঁড়েছে তাকে। হাতের রাইফেলটা একপাশে রক্তমাখা অবস্থায় পড়ে ছিল। সেটা ব্যবহারের সুযোগ পায়নি দেবীদয়াল।

কোনও চিৎকার শুনতে পায়নি কেউ। না দেবীদয়ালের আর্ত চিৎকার, না কোনও জন্তুর গর্জন। কেউ বলল, বীরদেওকে যে-নেকড়েটা খুন করেছে এ তারই কাজ। কেউ-বা বলল, চোপ্‌তার জঙ্গলে বেশ কিছু পাহাড়ী ভালুক আছে। এ-হত্যাকাণ্ড হয়তো তাদেরই কারও কাজ। আর একদল বারবার সংশয় প্রকাশ করতে লাগল।

একই সঙ্গে দ্বিতীয় যে-ঘটনা সকলকে নাড়া দিল তা হল ক্যাপ্টেন মথুর সিংয়ের উধাও হয়ে যাওয়া।

চোপ্‌তার জঙ্গলেরই অন্য এক প্রান্তে পাওয়া গেল তার পরনের পোশাক, আগ্নেয়াস্ত্র। তাহলে কি মথুর সিংও খুন হয়েছে দেবীদয়ালের মতো ? শুরু হয়ে গেল তৎপর মিলিটারি অনুসন্ধান। কিন্তু কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। বরং তদন্তে জানা গেল, দেবীদয়াল ও মথুর সিং, দু'জনকেই শেষ দেখা গিয়েছিল সন্ধে ছ'টা নাগাদ। ওরা কোথায় গিয়েছিল সে-কথা সঙ্গীসাথীরা কেউ জানে না। শুধু এটুকু শোনা গেল, বীরদেওর হত্যাকারী জানোয়ারটিকে ক'দিন ধরে পাহাড়ে-জঙ্গলে তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছিল দেবীদয়াল। আর মথুর সিং কিছুদিন যাবৎ ভীষণ বদমেজাজী হয়ে পড়েছিল।

মথুর সিংয়ের নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনা সীতাকে পাগল করে দিল।

অস্থির হয়ে উঠলেন অনন্তনারায়ণ বসুরায়। তাহলে কি শেষ পর্যন্ত ঘটে গেল অনিবার্য পরিণতি ? তিনি ভয় পেলেন সীতার জন্য। ভালোবাসার কাঙাল মেয়েটা আবার না ছুটে বেড়ায় বিপজ্জনক পাহাড়-জঙ্গলে ! ওকে আটকাতে হবে। আটকাতেই হবে !

অনন্তনারায়ণ খাঁচা-ঘরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিকেল পড়ে আসছে। রাত নেমে আসছে হামাগুড়ি দিয়ে। কুয়াশা জমাট বাঁধছে। নীলকণ্ঠের চূড়া তার ধারালো উজ্জ্বলতা হারাতে বসেছে। দিবস-সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বিচিত্র মিশ্র আবেগ অনুভব করছিলেন অনন্তনারায়ণ।

খাঁচার অবশিষ্ট দুটো কুকুর জুলজুল চোখে চেয়ে আছে। বীরদেও মারা যাওয়ার পর থেকে তিনি নিজেই ওদের দেখাশোনা করেন। একটা কুকুর অপরটার তুলনায় বেশি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কারণ, সে যেন টের পাচ্ছে আর ক'দিন পরেই পূর্ণিমা।

প্রাণী দুটোকে দেখতে দেখতে কেমন অবসাদ বোধ করছিলেন অনন্তনারায়ণ। আজ দ্বাদশী। কিছুক্ষণ আগেই দেবীদয়ালের মৃত্যুসংবাদ শুনেছেন তিনি। শুনেছেন মথুর সিংয়ের নিরুদ্দেশের ঘটনাও। আনন্দে-উল্লাসে ফেটে পড়া উচিত ছিল তাঁর। কিন্তু কই, মনে তো ফুর্তি নেই। বরং এক অবসাদ, অদ্ভুত বিষণ্ণতা, আর তীব্র আশঙ্কা। বিজ্ঞানের ভয়ঙ্কর পাগল করা নেশায় সবকিছু ভুলে গেছেন তিনি। ভুলে গেছেন দেশ-মাটি-মানুষের কথা।

দুর্ঘটনার খবরগুলো সীতাও পেয়েছে। পেয়েই বেরোতে যাচ্ছিল ও। অনন্তনারায়ণ বাধা দিয়েছেন।

'কোথায় যাচ্ছ ?'

'বাইরে—'

'কেন ?'

'মথুরকে পাওয়া যাচ্ছে না !'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে অনন্তনারায়ণ বলেছেন, 'আর পাওয়া যাবে না।'

'তবু আমাকে যেতেই হবে !' আবার পা বাড়িয়েছে সীতা।

অনন্তনারায়ণ ঝটিতি ওর হাত চেপে ধরলেন।

'না, তুমি যাবে না !'

সীতা হাত ছাড়াতে চেষ্টা করছিল প্রাণপণে। তীব্র স্বরে বলছিল, 'ছাড়ো ! ছেড়ে দাও বলছি !'

ধস্তাধস্তির মধ্যে অনন্তনারায়ণ ওর অস্বাভাবিক শক্তি অনুভব করছিলেন। এক অচেনা পাগলামি যেন ভর করেছে সীতার ওপরে।

'না, তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না। গেলে সাঙ্ঘাতিক বিপদের মুখে পড়বে—সে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।' অনন্তনারায়ণ হাঁপাচ্ছিলেন। অনুভব করছিলেন বয়েসের ভার, ক্লান্তির ছাপ।

'কীসের বিপদ ?' সীতা ধস্তাধস্তি থামিয়ে কুটিল চোখে তাকাল স্বামীর দিকে। তাঁর গূঢ় অভিসন্ধির পরিমাপ করতে চাইল যেন।

'সে তোমার শোনার দরকার নেই।' অধিকারের সুরে বলেছেন অনন্তনারায়ণ বসুরায়।

সীতার চোখ জ্বলছে। মুখ উত্তেজনার আঁচে গোলাপী।

'মথুরকে তুমি কোন বিপদে ফেলেছ ?' হিসহিসে স্বরে প্রশ্ন করল সীতা।

অনন্তনারায়ণ কোনও জবাব দেননি। ওকে ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন ঘর থেকে। তারপর বাড়ির সদর ও খিড়কি দরজা বন্ধ করেছেন ব্যস্ত হাতে। তালাও লাগিয়েছেন। সীতাকে তিনি বাড়ি ছেড়ে বেরোতে দেবেন না। কিছুতেই না ! ওকে নজরবন্দি করে রাখতে হবে। নইলে ও প্রাণে বাঁচবে না। ওর অবস্থাও হবে বীরদেও অথবা দেবীদয়ালের মতো।

এই প্রথম অনন্তনারায়ণ বসুরায় এখানকার পাট চুকিয়ে কলকাতায় চলে যাওয়ার কথা ভাবলেন। অশুভ এক ভয় তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছিল বারবার। লাইকান্‌থ্রপি থেকে তিনি প্রাণপণে মুক্তি চাইছিলেন।

নেকড়ের লালায় সংক্রামিত কুকুরটা চাপা ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল। থাবা বসাল খাঁচার দরজায়। অনন্তনারায়ণ সচকিত হলেন। ঘরের এককোণে একটা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে কাঁচা মাংস রাখা ছিল। সেটা নিয়ে খাঁচার ভেতরে ছুড়ে ছুড়ে দিতে লাগলেন। কুকুর দুটো ক্ষুধার্তের মতো হামলে পড়ে খেতে লাগল। প্রথম কুকুরটা মাঝে মাঝে খাওয়া থামিয়ে ছোট গর্জন করছিল। দ্বিতীয়টা চুপচাপ।

অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে দেখে বাতি জ্বেলে দিলেন অনন্তনারায়ণ। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। খোলা আকাশের নীচে দ্বাদশীর চাঁদ তাঁর নজর কেড়ে নিল।

আর মাত্র তিনদিন। তারপরেই পূর্ণিমা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনন্তনারায়ণ ঘরে ফিরে চললেন।

★

দেখতে দেখতে পূর্ণিমা এসে গেল।

মধুর সিংয়ের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি এখনও। মিলিটারি অনুসন্ধান ব্যর্থভাবে শেষ হয়েছে। তবে গতকাল কয়েকজন গাড়োয়ালি এসে অভিযোগ করেছে তাদের দুটি ভেড়া ও একটি চমরী গাই উধাও হয়ে গেছে। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে খোঁজ করতে তারা সাহস পাচ্ছে না। সারাটা অঞ্চল থমথমে আতঙ্কে ছেয়ে গেছে।

নিত্য প্রয়োজনীয় কাজে অনন্তনারায়ণ বাড়ি ছেড়ে বেরোচ্ছিলেন। তবে নিয়মমতো দরজায় তালা লাগিয়ে। কিন্তু আজ এক অশুভ আশঙ্কা তাঁকে সর্বক্ষণ ঘরে বন্দি রেখেছে। বহুদিন পর স্ত্রীকে সঙ্গ দিচ্ছেন তিনি। ওর সঙ্গে নানান আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু সকাল থেকেই সীতা কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে। কোনও কথা নেই মুখে। সংসারের কাজ সেরে আনমনা ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে এ-ঘর থেকে সে-ঘরে। অনন্তনারায়ণ আড়চোখে সর্বক্ষণ লক্ষ রাখছেন ওর আচরণের ওপরে। একটা ফাঁপা গুম-গুম শব্দ হচ্ছে তাঁর বুকের ভেতরে। খোলা জানলা দিয়ে শীতের বাতাস ঢুকছে। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে বারবার।

সময় বয়ে চলে। বেলা গড়িয়ে মেশে অবেলায়, অবেলা থেকে কালবেলায়। সন্ধের আঁধার নেমে আসে পার্বত্য অঞ্চলে। আশঙ্কা থেকে ভয়, ভয় থেকে আতঙ্ক জমাট বাঁধে।

বসবার ঘরে বসে ছিলেন অনন্তনারায়ণ। একটা বই খোলা রয়েছে টেবিলে। ঘরের মধ্যে কুয়াশা জড়ানো কেমন এক ধোঁয়াটে আলো। অনন্তনারায়ণ বই পড়ার ভান করছিলেন। তাঁর নজর ছিল বসবার ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে থাকা সীতার ওপরে। পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে বাইরের অন্ধকার দেখছে। দেখছে দূরের ঘন ছায়াময় পাহাড়ের মাথায় ঝুলে থাকা পূর্ণিমার চাঁদ।

হঠাৎই শোনা গেল চাপা ভয়াল গর্জন।

অনন্তনারায়ণ চমকে উঠলেন। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলেন চিৎকারটা আসছে খাঁচা-ঘর থেকে। অসুস্থ কুকুরটা ডাকছে। ওই ডাকের মধ্যেই রয়েছে তার উল্লাস, হিংসা, জ্বালা ও যন্ত্রণা।

কিন্তু সীতার মধ্যে কোনও চঞ্চলতা দেখা গেল না। ও একইভাবে দাঁড়িয়ে। চাঁদের নেশায় পেয়েছে ওকে। খাঁচা-ঘরের গর্জন আরও জোরালো হল। ধারাবাহিক ভাবে চলতেই থাকল।

অনন্তনারায়ণ আবার বইয়ের পাতায় চোখ ফেরালেন।

রাত ঘন হচ্ছে, সেইসঙ্গে শীত আর আতঙ্ক।

কিছুক্ষণ পরেই একটা দ্বিতীয় চিৎকার শোনা গেল।

বহুদূর থেকে বুকফাটা তীব্র গর্জন ভেসে আসছে আকাশ-বাতাস চিরে। যেন প্রথম গর্জনের উত্তর। দ্বিতীয় চিৎকারটা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই খাঁচা-ঘরের গর্জন স্তব্ধ হল। ফলে দূরের আর্তনাদটা আরও স্পষ্ট হল। কেঁপে কেঁপে ঢেউ তুলে এসে আছড়ে পড়ছে কানের পরদায়। নরকবাসী কোনও বিরহী প্রেতাত্মা যেন জান্তব চিৎকারে বুক ফাটিয়ে চলেছে।

হঠাৎই চিৎকারের স্বরটা চেনা চেনা ঠেকল অনন্তনারায়ণের কানে। নাকি তাঁর কল্পনা অথবা বিভ্রম? পুরনো একটা দৃশ্য ফিরে এল তাঁর চোখের সামনে।

আকাশে মলিন পূর্ণিমার চাঁদ। চারপাশে অন্ধকার গাছপালা। বিস্ময়স্তব্ধ একটা মানুষ চার হাত-পায়ে বসে রয়েছে পাথুরে জমির ওপরে। মাথা পিছন দিকে হেলিয়ে চাঁদ দেখছে। তার পুরু ঠোঁট চিরে বেরিয়ে আসছে অবাক-করা গর্জন। যে-গর্জনের অর্থ অ-মানুষটা নিজেও জানে না। শুধু উল্লাস, হিংসা, জ্বালা ও যন্ত্রণার চিৎকারে নিজেকে ডুবিয়ে দিচ্ছে।

'মথুর! মথুর!'

জানলার কাছ থেকে ছিটকে আসা পুরুষালী কণ্ঠস্বর অনন্তনারায়ণকে অবাক করে দিল। কর্কশ স্বরে জড়ানো উচ্চারণ যেন চাপা গর্জনেরই নামান্তর। কিন্তু সীতা তো এখনও একইভাবে দাঁড়িয়ে চাঁদ দেখছে! ওর অবছায়া শরীরের পিছনটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন অনন্তনারায়ণ। তাহলে...

অবাক ভাবটা কাটিয়ে ওঠার আগেই নতুন এক আঘাতে স্থবির হয়ে গেলেন তিনি এক তীব্র আতঙ্কঘন পাশবিক গর্জন ঘরের পরিবেশ কাঁপিয়ে দিল। অনন্তনারায়ণের যুক্তি, বুদ্ধি, বিশ্বাস ও অনুভূতির ঝুঁটি ধরে কেউ যেন প্রবল ঝাঁকুনি দিল বারবার।

এবং জানলায় দাঁড়ানো সীতা ঘুরে দাঁড়াল।

একসময়ে যে সীতা ছিল, এখন সে সীতা নয়। অন্য কিছু!

'মথুরের যদি কিছু হয় আমি তোমাকে...।'

অনন্তনারায়ণের স্মৃতি জট পাকিয়ে যাচ্ছিল।

ছায়াঘেরা অংশ থেকে ও আলোর বৃত্তে এগিয়ে এল। শোনা গেল দ্বিতীয় চিৎকার। আরও ভয়াল, আরও ভয়ঙ্কর। একই সঙ্গে তাল মিলিয়ে দূর—বহু দূর থেকে উত্তর দিচ্ছে অন্য কেউ।

গায়ের চামড়া কালচে খসখসে লোমশ। কোথায় সীতার যৌবনবতী পেলব শরীর! কোথায় সেই অপ্রতিরোধ্য কামনার নিশ্বাস! এখন শুধু হিংসা ও প্রতিশোধের বিষ ঝাপটা মারছে শীতের বাতাসে।

ও এগিয়ে আসছে পায়ে পায়ে। কুঁজো হয়ে ঝুঁকে পড়েছে সামনে। চোখ লাল। ঠোঁট সরে গিয়ে মাড়ি ও ভয়ঙ্কর দাঁত দেখা যাচ্ছে। ঠোঁটের কোণ দিয়ে লালা ছিটকে বেরোচ্ছে প্রতিটি গর্জনের সঙ্গে।

বিদ্যুৎঝলকের মতো পলকের জন্য অনন্তনারায়ণ বসুরায়ের মনে পড়ল, সীতার কোমল গলায় দংশনের দাগ দেখেছিলেন তিনি। তাহলে কি লালা থেকে রক্তে মিশে গেছে ভয়াবহ সংক্রামক ব্যাধির পৈশাচিক বীজ! জিতেন্দ্রনারায়ণ বসুরায়ের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহের কথা মনে পড়ল অনন্তনারায়ণের। আর তখনই জান্তব গন্ধ তাঁর গায়ে এসে হামলে পড়ল। সে অনেক কাছে এসে গেছে। উত্তপ্ত নিশ্বাস অনুভব করতে পারছেন তিনি।

অ-মানুষটা তাঁকে স্পর্শ করার আগেই পাগল হয়ে গেলেন অনন্তনারায়ণ বসুরায়। এবং মরণ আর্তনাদে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলেন। চিৎকার ও গর্জনের শব্দ জট পাকিয়ে আরও ভয়ঙ্কর চেহারা নিল। তারপর বিখ্যাত বিজ্ঞানীর উন্মাদ দৃষ্টির সামনে একটা কিংবদন্তী পরিণত হল বাস্তবে। সেই নিষ্ঠুর বাস্তবের সম্পূর্ণ চেহারাটা যদি দেখতে পেতেন তাহলে বারবার শিউরে উঠতেন অনন্তনারায়ণ। কিন্তু সে-সুযোগ তিনি পেলেন না। কারণ প্রথম আঘাতেই তাঁর প্রজ্ঞাময় চোখ দুটো টেবিলে খোলা বইয়ের ওপরে ছিটকে পড়েছিল।

জানলার ফ্রেমে পূর্ণিমার চাঁদ তখন নিষ্ঠুরভাবে হা-হা করে হাসছে।



জন্ম : ২২ অক্টোবর, ১৯৫১। কলকাতায়।
স্কুলের পড়াশোনা : হিন্দু স্কুলে। সাম্মানিক পদার্থবিজ্ঞানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজ থেকে ফলিত পদার্থবিজ্ঞানে বি. টেক., এম. টেক. ও পিএইচ. ডি.। পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক ও রৌপ্যপদক।
কর্মজীবনের শুরুতে কয়েক মাস কাজ করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ প্রজেক্টে, অতঃপর অধুনা ডেভেলাপমেণ্ট কন্‌সালট্যান্টস লিমিটেডের ইন্‌সট্রুমেণ্টেশান বিভাগে ডিজাইন এনজিনিয়ার হিসেবে, অবশেষে ১৯৮৩-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে লেকচারার। ১৯৯০ থেকে ওই বিভাগেই রিডার।
লেখালেখির শুরু ১৯৬৮-তে। অধুনালুপ্ত 'মাসিক রহস্য পত্রিকা'য়। বড়দের জন্য প্রথম কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস 'অমৃতবৃক্ষ'। বিমল কর সম্পাদিত 'শিলাদিত্য' পত্রিকায়, ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত। সেই বছরেই 'আনন্দমেলা'য় প্রকাশিত হয় প্রথম কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস 'সবুজ পাথর'।
প্রধান নেশা : লেখালেখি, জনপ্রিয়-বিজ্ঞান চর্চা, বিজ্ঞান গবেষণা এবং কম্পিটিউটার।
সম্পাদনা করেছেন অল্পকালজীবী কয়েকটি মাসিক পত্রিকা এবং বিমল করের 'গল্পপত্র' পত্রিকার বিশেষ কল্পবিজ্ঞান সংখ্যা।

প্রচ্ছদ ☐ অনুপ রায়

